বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ওয়াহাবীদের সৃষ্ট সংশয়ের অপনোদন

(শিয়া পরিচিতি ও সংশয়ের জবাব গ্রন্থ হতে নির্বাচিত)

মূল : আলী আসগার রেজওয়ানী

অনুবাদ : আবুল কাসেম

প্রকাশকাল : মুহররম ১৪২৭, ফেব্রুয়ারী ২০০৬

প্রকাশক : ইসলামী সেবা দপ্তর, কোম, ইরান

ই. মেইল : iso110@gmail.com

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

The elimination of the confusions created by Wahabis

Writer: Ali Asgar Rezwani,Translator: Abul Kasem,Publisher: Islamilc Services Office, Qom,Iran. Published on February 2006.

প্রকাশকের কথা

মহানবী (সা.)- এর ইন্তেকালের পরপরই যখন ইমামীয়া শিয়ারা একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, তখন থেকেই এই চিন্তা ও বিশ্বাসের ধারাটি সম্পর্কে বিভিন্ন রূপ সন্দেহ সৃষ্টি ও অপযুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তাকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ অপচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং কখনো তা তীব্র, আবার কখনো তা কিছুটা স্তিমিত হয়েছে।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের সময় দরবারী আলেমরা যারা ঐ অত্যাচারী শাসকদের থেকে পৃষ্ঠপোষকতা পেত তারা আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণ ও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে অপযুক্তি উপস্থাপন করত এবং সন্দেহ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাতো। এমনকি তারা তাঁদের মোকাবিলায় কৃত্রিম মাজহাব সৃষ্টি করে বিকৃত বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা এবং এর মাধ্যমে সর্বসাধারণকে আহলে বাইতের ইমামদের হতে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ক্ষমতাসীন শাসকদের পক্ষ থেকে প্রকৃত ইমামীয়া শিয়া বিশ্বাসকে দুর্বল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রূপ কৌশল গৃহীত হয়। অষ্টম হিজরীতে এসে ইবনে তাইমিয়ার আবির্ভাবের মাধ্যমে সন্দেহ সৃষ্টির ধারায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। ইবনে তাইমিয়া সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছেন শিয়াদের তাওহীদের বিশ্বাসকে (দুর্বল হাদীসসমূহের ভিত্তিতে) প্রশ্নের সম্মুখীন করতে। এমনকি তিনি মহানবী (সা.) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের সদস্যদের প্রতি শিয়াদের বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিরও সমালোচনা করেছেন।

ইবনে তাইমিয়ার অনুসৃত পন্থাটি দ্বিতীয় বারের মতো দ্বাদশ হিজরী শতাব্দীতে ওয়াহাবী ফির্কার প্রতিষ্ঠাতা আবদুল ওয়াহাব নজদীর মাধ্যমে পুনর্জীবিত ও গতিশীলতা লাভ করে। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে, বিশেষত শেষ দু'শতক ধরে শিয়া আকীদায় বিশ্বাসীদের পক্ষ হতে তাদের উত্থাপিত সন্দেহের জবাবে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। দুঃখজনকভাবে এ সত্ত্বেও শিয়াদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও সন্দেহ সৃষ্টির প্রয়াস বন্ধ হয় নি। বিভিন্ন কারণেই তারা এরূপ সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। তন্মধ্যে এই সকল ব্যক্তির বক্রচিন্তা, বোঝার অক্ষমতা, শিয়াদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

সম্পর্কে অজ্ঞতা, তাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন না করা, প্রথম শ্রেণীর শিয়া উৎসসমূহের সঙ্গে অপরিচিতি, হিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তি, মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইতের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ, দুনিয়ালোভ, সমসাময়িক শাসকদের সঙ্গে আঁতাত, শিয়াদের বিরুদ্ধে লিখতে তাদের শত্রুদের রচিত বইয়ের সাহায্য নেয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সময়ে প্রতি বছরই আমরা লক্ষ্য করছি শিয়া আকীদা- বিশ্বাসকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাষায় শত শত গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে যার অধিকাংশই ওয়াহাবী আকীদায় বিশ্বাসীদের রচিত। এ গ্রন্থগুলোর সবই একই ধাঁচের। বিগত একশ বছরে তাদের লেখনীতে তেমন কোন পরিবর্তন আসে নি, বরং তারা তাদের পূর্ববর্তীদের কথারই পুনরাবৃত্তি করে আসছে। এর বিপরীতে শিয়াদের পক্ষ হতেও শত শত গ্রন্থ রচিত হয়েছে যার ইতিবাচক প্রভাব সর্বত্রই লক্ষণীয়। এ গ্রন্থগুলো মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইতের ধারার পবিত্র বিশ্বাসসমূহের উপর আরোপিত সন্দেহসমূহের অপনোদনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। সম্প্রতি রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন আলী আসগার রেজওয়ানী রচিত ‘শিয়া পরিচিতি ও সংশয়ের জবাব’শীর্ষক গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য যা দু’খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অত্র গ্রন্থটি উক্ত গ্রন্থের নির্বাচিত আটটি অধ্যায়ের অনুবাদ। আমরা আশা করছি এটি প্রকাশের মাধ্যমে মহানবী (সা.) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের চিন্তাধারার প্রসারে ক্ষুদ্র একটি পদক্ষেপ হলেও নিতে পেরেছি। সবশেষে সম্মানিত আলেম আয়াতুল্লাহ্ আল উজমা সাইয়েদ আবদুল করিম মুসাভী আরদেবিলীর (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) দপ্তরের পক্ষ থেকে এই বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়া হয়েছে তার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। যদি কোন আগ্রহী ব্যক্তি এই মহান ফকীহর মূল্যবান ফতোয়াসমূহ হতে উপকৃত হতে চান, তাহলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

ই- মেইল : iso110@gmail.com

ইসলামী সেবা দপ্তর

কোম, ইরান

সুন্নাত ও বিদআত

ওয়াহাবীদের বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ হলো ‘বিদআত’। ওয়াহাবী আলেমদের ফতোয়াসমূহ থেকে বোঝা যায় এমন অনেক আমলই যা মুসলমানদের সর্ব সাধারণের কাছে সুন্নাত ও জায়েয বলে পরিগণিত ওয়াহাবীদের পক্ষ থেকে তা বিদআত বলে ঘোষিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো শরীয়তের বিধান বোঝার ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা ও স্থবিরতা। (তাদের গোঁড়ামী ও কূপমণ্ডুকতার কারণেই এক সময় তারা সাইকেলকেও শয়তানের বাহন বলে আখ্যায়িত করেছিল। অবশ্য এখন তাদের আলেমরা সৌদি সরকারের সর্বাধুনিক যানবাহনে আরোহণ করেন এবং তাকে বিদআত বলেন না) তাদের এরূপ চিন্তা- ভাবনার পিছনে বিশেষ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

আমরা জানি ইসলামের বিধানসমূহ যা মহানবী (সা.)- এর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তাকে সহজ শরীয়ত বলে অভিহিত করা হয়েছে। তদুপরি ওয়াহাবিগণ অসংখ্য জায়েয বিষয়কে বিদআতের শ্রেণীতে ফেলে তা হারাম বলে ঘোষণা করেছে। তাই আমরা প্রথমেই সুন্নাত ও বিদআতের সংজ্ঞা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থে সুন্নাত

সুন্নাত শব্দগতভাবে নিয়ম বা পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর বহুবচন হলো সুনান। সুন্নাত শব্দটি পবিত্র কোরআনে আল্লাহর জন্য যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ক্ষেত্রেও এসেছে, যেমন :

﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾

“আল্লাহর নীতি পূর্ব হতেই এরূপ (যে, সত্য মিথ্যার উপর বিজয়ী হবে) এবং আল্লাহর নীতিতে কোন পরিবর্তন নেই।” [১]

অন্যত্র বলেছেন : ﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ *"(তাদের জন্যও) পূর্ববর্তীদের পথ (পূর্ববর্তীদের জন্য আল্লাহর অনুসৃত রীতি) নির্ধারিত হয়ে গেছে।"* [২]

সুন্নাতুল্লাহ্ বা আল্লাহর নীতি বলতে তাঁর গৃহীত প্রজ্ঞাময় রীতি ও পদ্ধতি বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর চিরাচরিত নীতি বা রীতি এটাই যে, সময়ের পরিক্রমায় তিনি জাতির পর জাতিকে সৃষ্টি করেন, তাদের উদ্দেশে নবী, ধর্মগ্রন্থ ও শরীয়ত (বিধিবিধান) প্রেরণ করেন, তাদের আল্লাহর আনুগত্যের পথ দেখান এবং এভাবে তাদের পরীক্ষা করেন যাতে করে তারা স্বাধীনভাবে নিজেই নিজের পথকে বেছে নিয়ে ঈমান ও সৎকর্মের পথে অগ্রসর হয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে (আল্লাহর সন্তুষ্টি) পৌঁছতে পারে। কিন্তু পূর্ববর্তী অধিকাংশ জাতির অনুসৃত রীতি এটা ছিল যে, তারা আল্লাহর প্রেরিত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অন্যায় ও সীমা লঙ্ঘনের পথ গ্রহণ করত। এভাবে নিজেদের আল্লাহর জন্য একটি নীতির উপযুক্ত করত আর তা হলো আল্লাহর শাস্তির উপযোগী হওয়া। তারা আল্লাহর প্রেরিত নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আল্লাহর নির্ধারিত আজাবে পরিণত হয়ে ধ্বংস হতো। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾

"হেদায়েত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের জন্য (আল্লাহর) অনুসৃত রীতি অথবা কখন আসবে তাদের কাছে সরাসরি আজাব।" [৩]

মহানবী (সা.) ও আহলে বাইতের ইমামগণের হাদীসে সুন্নাত শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে :

ক) কোরআন ব্যতীত যা কিছু মহানবী (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের উন্নত জীবনের জন্য এনেছেন। এ অর্থে সুন্নাত একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্মীয় সকল বিধান- ইবাদত ও

লেনদেনসহ যাবতীয় বিধান (ফরজ, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ, চুক্তিসমূহ বৈধ বা অবৈধ হওয়া প্রভৃতি)- এর অন্তর্ভুক্ত।

খ) হাদীসসমূহে সুন্নাত শব্দটি শুধু পছন্দনীয় ও মুস্তাহাব কর্মের ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে।

যদি 'সুন্নাত'শব্দটি 'কিতাব'শব্দের পাশাপাশি আসে তার অর্থ হলো প্রথমটি। যেমন ইমাম সাদিক (আ.) হতে বর্ণিত হয়েছে :

ما من شيءٍ إلا و فيه كتابٌ أو سُنّةٌ

'এমন কোন বিষয় নেই যার বিধান 'কিতাব'অথবা 'সুন্নাতে'বর্ণিত হয় নি।[৪]

হাদীসসমূহে 'সুন্নাত'শব্দটি দ্বিতীয় অর্থেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে- السواک هو من السنّة و مطهرة للفم 'মিসওয়াক একটি সুন্নাত। তা মুখবিবরকে পরিচ্ছন্ন রাখে।'[৫]

অন্যত্র হাদীসে এসেছে-

من السنّة أن تُصلّى على محمد و أهل بيته فى كلّ جمعة ألف مرة

'এটি সুন্নাত বলে গণ্য যে, প্রতি শুক্রবারে তোমরা এক হাজার বার রাসূল ও তাঁর আহলে (.সা) 'বাইতের উপর দরূদ পড়বে।[৬]

ফিকাহবিদদের পরিভাষায় সুন্নাত হলো মহানবী (সা.) ও পবিত্র ইমামগণের বাণী (কাওল), কর্ম (ফেল) এবং নীরব সমর্থনের (তাকরীর) বিষয়সমূহ। সকল মুসলমানই মহানবীর নিষ্পাপত্বে বিশ্বাস করে। তাই তাঁর বাণী, কর্ম ও নীরব সমর্থনের সকল বিষয়ই সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু শিয়ারা রাসূলের আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণকেও নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করে সেহেতু তাঁদের বাণী (قول), কর্ম (فعل) এবং নীরব সমর্থনের (تقرير) বিষয়সমূহও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। কোন বিষয় সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত কিনা তার জন্য দু'টি পথ রয়েছে (১) মুতওয়াতির (বহুল বর্ণিত) হওয়া ও (২) গাইরি মুতাওয়াতির (অপেক্ষাকৃত কম বর্ণিত এবং একক সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ)। মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীস হতে মানুষ নিশ্চিত বিশ্বাস লাভ করে

যে, তা রাসূল ও ইমামগণ হতে প্রকৃতই বর্ণিত হয়েছে। তাই এরূপ হাদীসের বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গাইরি মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কখনো কখনো তার সঙ্গে এমন কিছু সমর্থক ইঙ্গিত থাকে যা মানুষকে হাদীসটি ইমাম হতে বর্ণিত হওয়াকেই প্রতিষ্ঠিত করে। এইরূপ সহায়ক উপাদান বিদ্যমান থাকলে সেরূপ হাদীসও নির্ভরযোগ্য ও পালনীয় বলে গণ্য। কিন্তু যদি কোন হাদীসের সঙ্গে সমর্থনকারী ইঙ্গিত না থাকে ও হাদীসটি ইমাম হতে বর্ণিত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকে তবে তা নিশ্চিত বর্ণিত বলা যায় না, বরং তা সম্ভাব্য বর্ণিত বলে গণ্য এবং এক্ষেত্রে যদি বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ (আদেল অর্থাৎ শিয়া ইমামী নির্ভরযোগ্য রাবী) ও বিশ্বস্ত হয় তবেই শুধু তা গ্রহণযোগ্য হবে।

শাব্দিক অর্থে বিদআত (بِدعَت)

বিদআতের শাব্দিক অর্থ হলো অভূতপূর্ব ও নতুন কোন বিষয়। এ শব্দটি শাব্দিক অর্থে সাধারণত কর্তার পূর্ণতা ও সৃষ্টিশীল বৈশিষ্টের ইঙ্গিতবহ। (بَدِيع) শব্দের অর্থ হলো অভিনব ও নজীরবিহীন, এ শব্দটি যখন মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হলো মহান আল্লাহ বিশ্বকে কোন পূর্ববর্তী নজীর ছাড়াই কারো সাহায্য ব্যতীত ও কোন প্রাথমিক উপাদান ভিন্নই সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন নমুনারই অনুসরণ করেন নি।[৭]

বিদআত শব্দটি হাদীস গ্রন্থসমূহে সাধারণত শরীয়ত ও সুন্নাতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন কিছু করা যা ইসলামী শরীয়ত ও মহানবী (সা.)- এর সুন্নাতের পরিপন্থী বলে গণ্য। হযরত আলী (আ.) বলেছেন :

إنّما النّاس رجلان متبع شرعة و مبتدع بدعة

অর্থাৎ 'মানুষ দু'ধরনের হয় শরীয়তের অনুসারী :, নতুবা ধর্মের মধ্যে নতুন কিছুর উদ্ভাবক'।[৮]

অন্যত্র তিনি মহানবীর নবুওয়াত সম্পর্কে বলেছেন :

إظهر به الشرائع المجعولة و قمع به البدع المدخولة

'মহান আল্লাহ মহানবীর মাধ্যমে মানব জাতিকে তাদের অজানা ও ভুলে যাওয়া শরীয়তের সাথে পরিচিত করিয়েছেন এবং পূর্ববর্তী (অজানা বিধানসমূহকে তাদের সামনে প্রকাশ করেছেন) শরীয়তসমূহের মধ্যে যেবিদআত ও নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ সংযোজিত হয়েছিল তা হতে পরিশুদ্ধ করেছেন।'[৯]

অন্যত্র আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেছেন :

ما أحدثت بدعة إلا ترک بها سنّة

'এমন কোন বিদআতই (নব উদ্ভাবিত বিষয়ই) শরীয়তে প্রবেশ করে নি যার দ্বারা কোন না কোন সুন্নাত উপেক্ষিত ও পদদলিত না হয়েছে।'[১০]

পারিভাষিক অর্থে বিদআত

ফিকাহশাস্ত্রবিদ এবং মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে বিদআতকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এখানে আমরা এরূপ কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করছি :

১। ইবনে রাজাব হাম্বালী বলেছেন : 'বিদআত হলো নব উদ্ভাবিত বিষয় যার শরীয়তগত কোন ভিত্তি ও দলিল- প্রমাণ নেই। যদি কোন কিছুর শারয়ী দলিল থাকে তবে তা বিদআত বলে গণ্য নয়, যদিও শাব্দিক অর্থে তা বিদআত হয়ে থাকে।'[১১]

২। ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন : 'বিদআত হলো নব উদ্ভাবিত এমন বিষয় যার কোন শরীয়তগত প্রমাণ ও দলিল নেই। যদি শরীয়তে তার সপক্ষে কোন দলিল থাকে তবে তা বিদআত বলে গণ্য হবে না।'[১২]

৩। সাইয়্যেদ মুর্তাজা বলেছেন : 'বিদআত হলো ধর্মে কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করে তাকে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত করা।'[১৩]

৪। আল্লামা মাজলিসী বলেছেন : ‘শরীয়তের ক্ষেত্রে বিদআত হলো এমন বিষয় যা রাসূলের মৃত্যুর পর ধর্মে সংযোজন করা হয়েছে এবং এর সপক্ষে কোন প্রমাণ কোরআন ও সুন্নাহয় নেই। তবে তা সাধারণ কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলে বিদআত হবে না।’[১৪]

হাদীসশাস্ত্র ও ফিকাহবিদদের বর্ণিত সংজ্ঞাসমূহ হতে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বিদআত পারিভাষিক অর্থে ধর্মে কোরআন ও সুন্নাহর দলিল ব্যতিরেকে কোন নতুন বিধান সংযোজন বা বিয়োজন।

সুতরাং এমন কোন বিষয় (বাণী ও কর্ম) যার শরীয়তে পূর্ব নজীর নেই কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহয় তার সপক্ষে দলিল- প্রমাণ রয়েছে অথবা তার ইঙ্গিত রয়েছে তবে তা বিদআত বলে গণ্য হবে না। যদিও মুজতাহিদ কোরআন ও সুন্নাহ হতে বিধান বের করতে ভুল করে থাকেন এবং হাদীস হতে সঠিক অর্থ উদঘাটনে ব্যর্থ হয়ে থাকেন। কারণ ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে শাস্তি দিবেন না।

এখানে উল্লেখ্য যে, বুদ্ধিবৃত্তিক অকাট্য বিধানও কোরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। অকাট্য বুদ্ধিবৃত্তি শরীয়তের বিধানের অন্যতম উৎস। যদি বুদ্ধিবৃত্তিক অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে কোন নতুন ধর্মীয় বিধান হস্তগত হয়, তবে তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

বিদআত হারাম

ধর্মের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন বা বিয়োজন এ অর্থে বিদআত হারাম কর্ম বলে বিবেচিত। কারণ শরীয়তের বিধান প্রণয়নের দায়িত্ব এককভাবে শুধুই আল্লাহর এবং তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত শরীয়তের বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার কারো নেই। পবিত্র কোরআন ধর্মীয় পুরোহিতদের অন্ধ অনুসরণের কারণে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের তীব্র সমালোচনা করেছে এবং তাদের নিরঙ্কুশ কর্মবিধায়ক নির্ধারণ করার কারণে ভর্ৎসনা করে বলেছে,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾

“তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ধর্মযাজক ও সংসার বিরাগী পুরোহিতদের নিজেদের পালনকর্তা বলে গ্রহণ করেছে।” [১৫]

যদিও ইহুদী আলেমরা তাঁদের অনুসারীদের নিজেদের উপাসনার দিকে আহ্বান করতেন না কিংবা তাঁদের অনুসারীরাও তাঁদের উপাসনা করত না, কিন্তু তাঁরা আল্লাহর হালাল করা বস্তুকে হারাম এবং হারাম করা বস্তুকে হালাল বলে ঘোষণা করতেন। জনসাধারণ তা জানা সত্ত্বেও তাঁদের আনুগত্য করত ও তাঁদের কথা শুনত। এ কারণেই এ আনুগত্যকে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিপালক গণ্যকারী বলেছেন যা প্রকৃতপক্ষে একরূপ উপাসনার নামান্তর।’[১৬]

খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾

“আর বৈরাগ্য, তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল যা আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারণ করেন নি।”[১৭]

সহীহ হাদীসসমূহেও কঠোরভাবে বিদআতকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, كل بدعةٍ ضلالة، و كلّ ضلالة سبيلها فى النار ‘প্রতিটি বিদআতই স্পষ্ট বিচ্যুতি এবং প্রতিটি বিচ্যুতির পরিণতিই জাহান্নাম।’[১৮]

বিদআতের উপাদানসমূহ

হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রবিদদের উপস্থাপিত সংজ্ঞা হতে আমরা বলতে পারি, বিদআতের তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছে :

১। যদি কেউ কোন বিধান বা আদেশকে ধর্মের উপর আরোপ করে অথবা কোন ধর্মীয় বিধিকে ধর্ম বহির্ভূত বলে ঘোষণা করে তা বিদআত হবে। যেমন যদি কেউ الصلوة خيرٌمن النوم- কে আজানের অংশ বলে ঘোষণা করে অথবা ‘মুতা বিবাহ’যা রাসূলের যুগে বৈধ ঘোষিত ছিল তা

অবৈধ বলে ঘোষণা করে। মহান আল্লাহ মুশরিকদের এ জন্য তিরস্কার করেছেন যে, তারা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করত।

﴿ قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ *"বলুন, আল্লাহ কি তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন নাকি তোমরা আল্লাহর উপর অন্যায় মিথ্যারোপ করে থাক।"* [১৯]

অন্যত্র বলেছেন,

﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

"তাদের জন্য দুর্ভোগ যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লিখে, অতঃপর বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। যাতে করে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে।" [২০]

২। বিদআত তখনই নিন্দনীয় ও হারাম হবে যখন তার প্রণনয়নকারী তার নষ্ট ও বিকৃত বিশ্বাস অথবা শরীয়তে অবৈধ ঘোষিত কোন কর্ম সমাজে প্রচার করবে। কেবল এরূপ বিশ্বাস পোষণ বা গোপনে এরূপ কর্ম সম্পাদন কোন বিষয় বিদআত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

মুসলিম নিজ সূত্রে মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন,

من دعا ألی ضلالة کان علیه من الإثم مثل آثام من یتبع لا ینقص ذلک من آثامهم شيئا

'যে কেউ বিচ্যুতির দিকে আহ্বান করবে, তার গুনাহ ঐ সকল ব্যক্তির গুনাহের সমান যারা ঐ কাজে তাকে অনুসরণ করবে অবশ্য ঐ গুনাহের অনুসরণকারীদের পাপ হতে এতে কিছুই কম করা হবে না।'[২১]

এই হাদীসটিতে বিদআতের প্রতি আহ্বানের উল্লেখ রয়েছে যা তা প্রচারের দিকটির প্রতি ইশারা করছে।

৩। দ্বীনের মধ্যে উদ্ভাবিত বিষয়টি বিদআত হতে হলে এর কোরআন ও সুন্নাহিভত্তিক কোন দলিল থাকা চলবে না। বিদআতের পারিভাষিক যে সংজ্ঞা আমরা উল্লেখ করেছি তা হতে স্পষ্ট বোঝা যায় কোন বিষয় বিদআত হওয়ার এটি অন্যতম শর্ত। তাই দু'টি বিষয় বিদআতের অন্তর্ভুক্ত নয় :

ক) নব উদ্ভাবিত বিষয়টি অভিনব হলেও তার জন্য শরীয়তে বিশেষ দলিল বিদ্যমান রয়েছে, যদিও তা রাসূলের জীবদ্দশায় না ঘটে থাকে। যেমন রাসূলের জীবদ্দশায় মদীনায় কখনোই ভূমিকম্প হয় নি। তাই ‘সালাতুল আয়াত’যা ভীতিকর যে কোন কারণে পড়া হয় এক্ষেত্রে পড়া হয় নি, কিন্তু পরবর্তীতে কুফায় একবার ভূমিকম্প হলে ইবনে আব্বাস ভূমিকম্পের জন্য আয়াতের নামায পড়েন।

খ) এমন সকল বিষয় যা ইসলামের সর্বজনীন নীতির অধীন। ঐ সর্বজনীন বিধানই ইসলামী শরীয়তের রক্ষক ও নিশ্চয়তা দানকারী ঐ অর্থে যে, শরীয়তে বিদ্যমান সর্বজনীন দলিলসমূহই নতুন উদ্ভাবিত বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এটিই ইসলামী বিধানের গতিশীলতার টিকে থাকার রহস্য। এ কারণেই শরীয়তে উদ্ভূত নতুন কোন বিষয়কে এ নীতির ভিত্তিতে ধর্মীয় বলে ঘোষণা করা হলে যদি তার জন্য বিশেষ কোন বিধান শরীয়তে (কোরআন ও সুন্নাহতে) পাওয়া না যায়, কিন্তু তা ঐ সর্বজনীন দলিলসমূহের আওতায় পড়ে, তবে তা বিদআত বলে গণ্য হবে না। যেমন আল কোরআনের এ আয়াতটি :

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾

“তোমাদের শত্রুদের জন্য তোমাদের সাধ্যমত সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখ।” [২২]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হলেও যেহেতু এর আহ্বান সর্বজনীন ও সাধ্যমত সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখার বিষয়টি বর্তমানে তৎকালীন সময়ের হতে ভিন্নরূপ। তাই এখন কোন মুসলিম দেশের উচিত হবে শত্রুদের সন্ত্রস্ত রাখতে আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম, যেমন, ট্যাংক, যুদ্ধ বিমান, নৌবহর ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত রাখা। সহীহ বুখারীতে রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : ‘তোমাদের মধ্যে সে- ই উত্তম যে নিজে কোরআন শিক্ষা লাভ করে এবং অন্যকে তা শিক্ষাদান করে।’এখন যদি কেউ আধুনিক পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা করে তবে তা ঐ নির্দেশের বহির্ভূত বলে গণ্য হবে না। কারণ তা এই সর্বজনীন নির্দেশের অন্তর্গত। এ যুক্তিতে ইবনে তাইমিয়া ও ওয়াহাবীদের ঘোষিত অনেক বিষয়ই বিদাআতের সীমার বাইরে পড়বে। যেমন, কবরের উপর সৌধ নির্মাণ, আল্লাহর ওলীদের জন্য শোক পালন, তাঁদের জন্মদিনে

উৎসব পালন ইত্যাদি। কারণ এর সবগুলোই মহান আল্লাহর সর্বজনীন বিধান নিম্নোক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে :

﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾

“এবং কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহভীতি প্রসূত।” [২৩]

আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে বিদআতে হাসানাহ ও বিদআতে কাবিহ

পূর্ববর্তী আলোচনা হতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদআত নিন্দনীয় (অপছন্দনীয়) একটি বিষয় এবং তা শরীয়তের বিধান মতে হারামের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিদআতকে হাসান (পছন্দনীয়) ও কাবিহ (অপছন্দনীয়) এ দু'ভাগে ভাগ করা সঠিক নয়। কিন্তু আহলে সুন্নাতের আলেমদের মতে বিদআত 'হাসান'ও 'কাবিহ'এ দু'ভাগে বিভক্ত। [২৪]

বিদআতকে বৈধ ও অবৈধ অর্থাৎ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় এরূপ বিভাজনের কোন বৈধতা নেই। কারণ বিদআত হলো এমন বিষয় যার কোন শরীয়তগত ভিত্তি নেই অর্থাৎ এমন কোন বিধান সৃষ্টি করা যার উৎস কোরআন ও সুন্নাতে খুঁজে পাওয়া যায় না, তা- ই বিদআত। তাই এরূপ বিধান নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় ও হারাম বলে গণ্য।

কোন বিষয় বা কর্মে মোবাহের কর্মগত বিধান

(যে ক্ষেত্রে শরীয়ত কোন বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করে নি সেক্ষেত্রে ঐ বিষয়টি বৈধ হওয়ার সার্বিত নীতি)

উসূলশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ বলে থাকেন, 'কোন বিষয় বা কর্মের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো বৈধতার নীতি অর্থাৎ যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা না থাকে তবে সেক্ষেত্রে বৈধতার অথবা স্বাধীনতার সর্বজনীন নীতি কার্যকর হবে। যাকে উসূলশাস্ত্রের পরিভাষায় আসালাতুল হিল্লিয়াত (বৈধতার সর্বজনীন নীতি) অথবা আসালাতুল জাওয়ায বলা হয়। স্বাধীনতার সর্বজনীন নীতি (আসালাতুল বারায়াত) হতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এ নীতি মতে যে বিষয়ে শরীয়তের প্রবর্তক করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়কে বর্ণনা করেন নি সে বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বলে গণ্য অর্থাৎ সেক্ষেত্রে শরীয়তের অনুসারীদের স্বাধীনতা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾

"আপনি বলে দিন ; যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্য যা সে ভক্ষণ করে; কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস- এটা অপবিত্র ও অবৈধ- অথবা যবেহ করা জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয় সে কারণে।" [২৫]

ড. ইউসুফ কারদ্বাভী বলেছেন, 'ইসলাম সর্বপ্রথম যে নীতি প্রবর্তন করেছে তা হলো সকল বস্তু ও কল্যাণকর বিষয়ের ক্ষেত্রে বৈধতার সর্বজনীন নীতি এবং যে বিষয়গুলো শরীয়তের প্রবর্তক সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেন নি, তার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা হতে মুক্তির নীতি।'[২৬]

রাসূল (সা.)- এর আহলে বাইতের অনুসৃত নীতিও সুন্নাত বলে গণ্য এবং তা শরীয়তের নীতি নির্ধারক।

এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোকে ওয়াহাবীরা এজন্য বিদআত বলে থাকে যে, তারা রাসূলের আহলে বাইতের সুন্নাতকে শরীয়তের জন্য নীতি নির্ধারক ও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। অথচ সহীহ হাদীসসমূহে তাদের অনুসৃত কর্ম ও নীতিও শরীয়তের নির্ধারক ও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ঘোষিত হয়েছে। এখানে আমরা এরূপ কয়েকটি দলিলে প্রতি ইশারা করছি।

১। আয়াতে তাত্বহীর

মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ চান হে তোমাদের হতে সকল অপবিত্রতা দূর করতে !আহলে বাইত (নবীর) এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।" [২৭]

সহীহ মুসলিম হযরত আয়েশা সূত্রে বর্ণনা করেছে যে, একদিন সকালে মহানবী (সা.) গৃহ হতে বের হলেন এবং তখন তাঁর কাঁধে সেলাইবিহীন বিশেষ চাদর ছিল। (অতঃপর যখন তিনি বসলেন) তখন হাসান ইবনে আলী এসে ঐ চাদরের ভিতর প্রবেশ করল, তারপর হুসাইন তাতে প্রবেশ করল, তারপর ফাতেমা আসলে তাঁকেও চাদরে আবৃত করলেন, অতঃপর আলী আসলে তাঁকেও তাতে আবৃত করলেন। তাঁরা সকলে প্রবেশ করলে রাসূল এ আয়াতটি পাঠ করলেন, [২৮]

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

আয়াতটির লক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

প্রথমত আয়াতটিতে ((إنّما)) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যা দ্বারা বিধানকে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর জন্য সীমিত করা হয় এবং এটি সীমিতকরণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যকরণশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আয়াতটিতে আল্লাহর ইচ্ছা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের (আহলে বাইতের) জন্য নির্দিষ্ট ঘোষিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত আয়াতটিতে আল্লাহর ইচ্ছা অবশ্যম্ভাবী ইচ্ছার (ইরাদায়ে তাকভীনি) অন্তর্ভুক্ত যার কোন ব্যত্যয় হয় না, إنّما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكن "কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন : 'হও', অতঃপর তা হয়ে যায়।"

আয়াতটিতে (আয়াতে তাত্বহীরে) আল্লাহর অবশ্যম্ভাবী ইচ্ছার (ইরাদায়ে তাকভীনী) প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেননা তা শরীয়তের বিধানগত ইচ্ছার (ইরাদায়ে তাশরীয়ী) অন্তর্ভুক্ত হলে যাতে বান্দার স্বাধীনতা রয়েছে সকল বান্দাই তার অন্তর্ভুক্ত হতো ও এরূপ পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা সবার জন্য প্রযোজ্য হতো। সেক্ষেত্রে আলাদাভাবে আহলে বাইতকে উল্লেখ মূল্যহীন হয়ে পড়ত। অর্থাৎ এ আয়াতে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর বিশেষ অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছার প্রতিফলনের কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত আয়াতটিতে যে رجس বা অপবিত্রতার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ এমন অপবিত্রতা যা বস্তুর প্রতি অন্যদের ঘৃণার উদ্রেক করে। তাই কোরআন رجس শব্দটি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় অপবিত্রতার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছে। যেমন :

﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾

"অথবা শুকরের মাংস, নিশ্চয়ই তা অপবিত্র" এবং

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

"এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তা তাদের অপবিত্রতার উপর (সন্দেহ ও কপটতার) অপবিত্রতা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।" (সূরা তওবা: ১২৫)

এর বিপরীতে পবিত্রতাও বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়ে হতে পারে। আল্লামা তাবাতাবায়ী বলেছেন: রিজস বা অপবিত্রতা হলো এমন আত্মিক অনুভূতি ও প্রভাব যা বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত বিশ্বাস এবং নিকৃষ্ট কর্ম হতে উদ্ভূত। আলোচ্য আয়াতে رجس শব্দটির পূর্বে ال এসেছে যা 'আলিফ ওয়া লামে জিন্স ' নামে অভিহিত তা সকল প্রকৃতির অপবিত্রতাকে শামিল করে। তাই আয়াতে আত্মিক অপবিত্রতা অর্থাৎ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বা কর্মের ক্ষেত্রে ভুলের কারণ হতে পারে এমন সকল অপবিত্রতা হতেও মুক্তি ও পবিত্রতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এবং এরূপ পবিত্রতা কেবল ঐশী নিষ্পাপত্বের (স্রষ্টা প্রদত্ত পবিত্রতার) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে এমন আত্মিক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যা তাকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অসৎ কর্ম হতে নিবৃত রাখে।'[২৯]

যে বিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছার অধীনে সকল প্রকার ত্রুটি ও পাপ- পঙ্কিলতা হতে মুক্ত ঘোষিত হয়েছেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা নিষ্পাপ ও পবিত্র এবং যে কোন পবিত্র ও নিষ্পাপ ব্যক্তির কর্ম ও নীতি আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে হওয়ায় সুন্নাত ও সকলের জন্য প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য। তাই আল্লাহর নবীর আহলে বাইতের সদস্যদের অনুসৃত নীতিও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ও প্রামাণ্য দলিল বলে গণ্য।

২। হাদীসে সাকালাইন

তিরমিযী তাঁর সহীহ গ্রন্থে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.)- কে বিদায় হজ্জের সময় উটের পিঠে বসে বক্তব্য দিতে দেখলাম ও তাঁকে বলতে শুনলাম :

'হে লোকসকল! আমি তোমাদের মাঝে দু'টি মূল্যবান ও ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধর, তাহলে কখনোই বিভ্রান্ত হবে না : আল্লাহর কিতাব ও আমার রক্ত সম্পর্কীয় আহলে বাইত।'[৩০]

হাদীসটি হতে বিভিন্নভাবে মহানবীর আহলে বাইতের নিষ্পাপত্ব প্রমাণ করা যায়। হাদীসটিতে কোরআন ও আহলে বাইতকে একত্রে উল্লেখ করে উভয়কে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে। তাই কোরআন যেরূপ সকল প্রকার ভুল- ত্রুটির ঊর্ধ্বে, আহলে বাইতও সেরূপ সকল ভুল- ত্রুটির ঊর্ধ্বে।

বারজাখের জীবন

(মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অন্তর্বর্তীকালীন জীবন)

ওয়াহাবীদের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্যের একটি বিষয় হলো বারজাখ বা মৃত্যু পরবর্তী কবরের জীবন। আল্লাহর আউলিয়ার (ওলীদের) রুহ হতে সাহায্য চাওয়া, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের উসিলা দিয়ে আল্লাহর নিকট চাওয়া (তাওয়াসসুল) ইত্যাদি বিষয়ে অন্যান্য মুসলমানের সাথে ওয়াহাবীদের মতপার্থক্য উপরিউক্ত মতভিন্নতারই ফলশ্রুতিতেই ঘটেছে। অন্যান্য সকল মুসলমানই বিশ্বাস রাখেন দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ বারজাখে মানুষের, বিশেষত আল্লাহর ওলীদের বিশেষ জীবন রয়েছে। কিন্তু ওহাবিগণ মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবনে, এমনকি আল্লাহর ওলীদের ক্ষেত্রেও বিশ্বাসী নয়। এ কারণেই তাঁদের নিকট সাহায্য চাওয়া, তাঁদেরকে মাধ্যম বা উসিলা হিসেবে গ্রহণকে জায়েয মনে করে না, বরং এক প্রকার শিরক বলে বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর ওলীদের প্রতি (মৃত্যুর পরে) আহ্বানকে পাথরের ন্যায় প্রাণহীন বস্তুর প্রতি আহ্বান মনে করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে আল্লাহর ওলিগণ মৃত্যুর পর অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না এবং পৃথিবীর উপর তাঁদের কোন প্রভবই নেই। আমরা এখন এ বিশ্বাস নিয়ে মৌলিক আলোচনা করব।

ওয়াহাবীদের ফতোয়াসমূহ

১। বিন বায বলেছেন, 'দ্বীনের অপরিহার্য ও স্বীকৃত বিশ্বাসসমূহ এবং শরীয়তী দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) সকল স্থানে বিদ্যমান নন বরং তাঁর দেহ (মোবারক) মদীনায় রয়েছে তবে তাঁর রুহ বেহেশ্তে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে রয়েছে। [৩১]

তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'আহলে সুন্নাতের এক বৃহৎ অংশ মৃত্যুর পর কবরের জীবনে (বারজাখী জীবনে) বিশ্বাসী । কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কবরে শায়িতরা 'গাইব'বা অদৃশ্যের

জ্ঞান রাখেন অথবা পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে খবর পান বরং এ বিষয়গুলো হতে তাঁরা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন।

একই গ্রন্থে অন্য স্থানে তিনি বলেছেন, 'মহানবী (সা.) তাঁকে সালামকারী ব্যক্তিকে দেখতে পান- এ কথাটির আদৌ কোন ভিত্তি নেই। কোরআন ও হাদীসে এর সপক্ষে কোন দলিল নেই। রাসূল (সা.) দুনিয়াবাসীর এবং পৃথিবীর উপর যা কিছু ঘটছে সে সম্পর্কে কোন কিছুই জানেন না। কারণ মৃত ব্যক্তির সাথে এ পৃথিবীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। [৩২]

২। বিশিষ্ট ওহাবী হাদীসবিদ নাসিরউদ্দিন আলবানী তাঁর 'আল আয়াতুল বাইয়্যেনাহ্ আলা আদামে সিমায়েল আসওয়াত'গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্ব এবং এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের জানানোর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আশা করি কিছু জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট হয়েছে, বিশেষত যারা সবসময় অজ্ঞতার অন্ধকারে বাস করে তাদের জন্য নিমোক্ত বিষয়সমূহ, যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা, নবিগণ, আল্লাহর ওলী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের রুহের নিকট মুক্তি কামনা করা, এরূপ ধারণা ও বিশ্বাস রাখা যে, তাঁরা তাদের কথা শুনতে পারছেন ইত্যাদি বিষয় আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হবে।

মানুষ রুহ ও দেহের সমন্বয়ে সৃষ্ট

কালামবিদগণ মানুষকে দুই সত্তার সমন্বয় বলে বিশ্বাস করেন, যথা রুহ (আত্মা) ও দেহ। এই দুইয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে তাঁরা বেশ কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এখানে আমরা তার কয়েকটি উল্লেখ করছি :

১। প্রত্যেক মানুষই নিজ কর্মকে এক বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন সত্তার সাথে সম্পর্কিত করে যাকে 'আমি'বলে অভিহিত করে থাকে এবং দাবী করে 'আমি অমুক কাজটি করেছি, 'আমি অমুককে মেরেছি'ইত্যাদি। এই 'আমি'সত্তাটি কি? এটি কি মানবের সেই সত্তা নয় যাকে 'রুহ'বা 'আত্মা'নামে অভিহিত করা হয়, অনুরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই তার দৈহিক অঙ্গ- প্রত্যঙ্গগুলোকে এক

বাস্তব সত্তার সাথে সম্পর্কিত করে বলে, আমার হৃদয়, আমার উদর, আমার পদযুগল ইত্যাদি। এই 'আমি'সত্তাটি কি রুহ বা নাফস ব্যতীত অন্য কিছু?

২। প্রত্যেক মানুষ এই অনুভূতিটি ধারণ করে যে, তার ব্যক্তিত্ব ও সত্তা সময়ের পরিবর্তনে অপরিবর্তিত রয়েছে যাতে কোনরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয় না, অথচ তার দেহে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এই অপরিবর্তিত সত্তাই কি তার আত্মা বা নাফস নয়?

৩। কখনো কখনো মানুষ সবকিছু, এমনকি তার দেহ ও অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ সম্পর্কেও অসচেতন হয়ে যায়; কিন্তু সে মুহূর্তেও সে তার 'আমি' সত্তা সম্পর্কে অসচেতন নয়। এটি কি তার আত্মা বা নাফস নয়? ফখরুদ্দীন রাজী বলেছেন, 'কখনো কখনো আমি নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন, অথচ আমার দৈহিক সত্তা সম্পর্কে অবচেতন থাকি। আমার ঐ আত্মসচেতনতাই আমার আত্মা ও নাফস।'[৩৩]

পবিত্র কোরআনও এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে :

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন কর এমন অবস্থায় যে, তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট; আমার বিশেষ বান্দাদের (নৈকট্যপ্রাপ্ত) অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার বেহেশ্তে প্রবেশ কর।' [৩৪]

অন্যত্র বলেছেন :

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ﴾

'অতঃপর যখন তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় তোমরা তা প্রত্যক্ষ কর। (তার শিয়রে দাঁড়িয়ে)' (সূরা ওয়াকেয়া : ৮৩- ৮৪)

পৃথিবী হতে বিদায় নেয়ার পরও জীবনের অব্যাহত থাকা

পবিত্র কোরআনের আয়াত হতে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, মানুষের মৃত্যু তার জীবনের শেষ নয়, বরং সে অন্য এক জীবনে প্রবেশ করে ও স্থানান্তরিত হয়। মানুষ মৃত্যুর পর বস্তুগত জগতের ঊর্ধ্বে এক নতুন জগতে অধিকতর বিস্তৃত জীবন লাভ করে। যেমন :

১। মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

‘আল্লাহ মৃত্যুর সময় প্রাণকে পূর্ণরূপে হরণ করেন এবং (তার প্রাণকে) যে ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে ও মৃত্যুবরণ করে নি। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত হয়েছে তার প্রাণকে আবদ্ধ রাখেন এবং অন্যান্যদেরকে (প্রাণ) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফিরিয়ে দেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী (আল্লাহর ক্ষমতার) রয়েছে।’[৩৫]

২। অন্যত্র বলা হয়েছে :

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

‘যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদের তোমরা মৃত ভেবো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে জীবিকাপ্রাপ্ত।’[৩৬]

অন্য একটি আয়াত হতে জানা যায় এই বিশেষ জীবন (বারজাখের জীবন) শুধু শহীদদের জন্যই নয়, বরং আল্লাহর সকল অনুগত ও সৎকর্মশীল বান্দার জন্য নির্ধারিত।

মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾

‘যারা আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য করবে তারা সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গে থাকবে নবিগণ, সত্যবাদিগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য হতে যাদের তিনি নিয়ামত দিয়েছেন। তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!’ [৩৭]

যদি শহীদগণ আল্লাহর নিকট জীবিত থাকেন ও জীবিকা লাভ করেন তবে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে- যেহেতু রাসূল নিজেও তাঁর আনীত নির্দেশের আনুগত্যকারী, সেহেতু তিনিও এর অন্তর্ভুক্ত- সেও শহীদদের সাথে থাকবে, কারণ উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকারী শহীদদের সঙ্গে থাকবে বলা হয়েছে। যদি শহীদরা মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট জীবিত থাকে তবে তারাও আল্লাহর নিকট জীবিত রয়েছে ও বারজাখী জীবনের অধিকারী। যদি বিন বাযের মতো কেউ বলেন, ‘তাঁরা আল্লাহর নিকট বেহেশ্তে রয়েছেন এবং এই পৃথিবীর কোন খবর রাখেন না’, এর জবাবে বলব, ‘আল্লাহ নিজের সম্পর্কে বলেছেন :

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾

‘তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন।’[৩৮]

﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾

‘তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকেই তিনি আছেন।’[৩৯]

﴿نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

‘আমরা তার শাহরগ হতেও তার নিকটবর্তী।’[৪০]

যদি আল্লাহ সকল স্থানে সকলের সাথে থাকেন তবে যেহেতু শহীদগণ তাঁর নিকটে অবস্থান করছেন তাঁরাও তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত হিসেবে সকল স্থানের উপর পূর্ণ দৃষ্টি লাভ করেছেন এবং অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। আল্লাহর অলী ও অনুগত সৎকর্মশীল বান্দারাও তদ্রুপ। কোরআন বলছে :

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾

‘তিনি চক্ষুসমূহের বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তরসমূহ যা গোপন করে সে সম্পর্কে (আল্লাহ) অবহিত।’[৪১]

যে সর্বজ্ঞ আল্লাহ সবকিছু জানেন তিনিই তাদেরকে অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত করেন। তিনিই তাঁর রাসূলকে অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন।

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾

‘তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী এবং তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রপশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।’[৪২]

বিভিন্ন হাদীসেও এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বদর যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) যখন মুশরিকদের মৃতদেহগুলো একটি গর্তে নিক্ষেপ করলেন তখন সেই মৃত মুশরিকদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, ‘নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর রাসূলের মন্দ প্রতিবেশী ছিলে, তাকে তোমরা তার গৃহ হতে বহিষ্কার ও তাকে প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হও নি বরং তার বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলে। আমাকে আমার প্রতিপালক যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য পেয়েছি।’এক ব্যক্তি মহানবীকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘হে আল্লাহর নবী! আপনি কিরূপে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাগুলোর সাথে কথা বলছেন?’মহানবী তাকে বললেন, ‘তুমি তাদের হতে অধিক শুনতে পাও না।’[৪৩]

আনাস ইবনে মালিক মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, ‘যখন কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর কবরে শুইয়ে তার সঙ্গীরা তাকে ত্যাগ করে চলে যায়, তখন সে তাদের পদধ্বনি শুনতে পায়।’[৪৪]

মুত্তাকী হিন্দী স্বীয় সূত্রে নবী করিম (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত না করে যায়, তাকে মৃতদের সাথে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে না।’বলা হলো : ‘হে আল্লাহর রাসূল! মৃতরা কি কথা বলে?’তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তারা পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করে।’[৪৫]

পৃথিবীর জীবন ও মৃত্যু পরবর্তী কবরের জীবনের মধ্যে সংযোগ

পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ ও হাদীস হতে জানা যায় যে, পৃথিবীর অধিবাসী জীবিত মানুষ ও কবরবাসী মৃত মানুষের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে এ অর্থে যে, যখন জীবিত কোন মানুষ তাদেরকে ডাকে ও সম্বোধন করে কিছু বলে অথবা চায় তারা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে তার উত্তর দিয়ে থাকে। এখানে আমরা এ সম্পর্কিত কিছু আয়াত ও হাদীসের প্রতি ইশারা করছি।

ক) আয়াতসমূহ :

মহান আল্লাহ হযরত সালিহ (আ.)- এর জাতি সম্পর্কে বলেছেন,

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۞ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾

অতঃপর ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল। ফলে তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (হযরত সালেহ) তাদের (মৃতদেহগুলো) হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও বললেন : হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের নির্দেশ ও বাণী পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি, কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাস না।' [৪৬]

২। হযরত শুয়াইব (আ.)- এর উম্মত সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

৩। অন্যত্র বলা হয়েছে :

﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾

'আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছি তাদের জিজ্ঞাসা করুন, পরম করুণাময় (আল্লাহ) ছাড়া কি অন্য কোন উপাস্য আমি ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করেছিলাম।' [৪৭]

৪। অন্যত্র কয়েকটি আয়াতে বিভিন্ন নবীর উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করে বলেছেন :

﴿سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾

'বিশ্ববাসীদের মধ্যে নূহের উপর সালাম।'[৪৮]

﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾

'ইবরাহিমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'[৪৯]

﴿سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾

‘মূসা ও হারুনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।’[৫০]

﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ﴾

‘ইল ইয়াসিনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।’[৫১]

﴿سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾

নবিগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।[৫২]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ হতে বোঝা যায় পৃথিবীর জীবন ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে এবং কবরে মানুষ ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের কথোপকথন শুনতে পায় ও তাদের সালামের জবাব দান করে ।

শেখ মাহমুদ শালতুত বলেছেন, ‘কোরআন ও হাদীস হতে জানা যায় যখন মানুষের দেহ হতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয় তখন সে মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু তখনও তার অনুধাবন ক্ষমতা থাকে (ও অন্যরূপ জীবন নিয়ে সে বেঁচে থাকে) এবং তাকে কেউ সালাম দিলে সে তা শুনতে পায়, তার কবর জিয়ারতকারীকে চিনতে পারে ও কবরে বেহেশ্তী নিয়ামত ও দোযখের আজাবকে অনুভব করে।[৫৩]

শাইখুল ইসলাম ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম তাঁর ফতোয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ‘বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় মৃত ব্যক্তি তার জিয়ারতকারীকে (সাক্ষাৎকারী জীবিত ব্যক্তিকে) চিনতে পারে । কারণ শরীয়ত আমাদের নির্দেশ দিয়েছে মৃত ব্যক্তিকে সালাম দেয়ার এবং শরীয়তের প্রবক্তা কখনোই এমন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার নির্দেশ দেন নি যে শুনতে পায় না।’[৫৪]

খ) হাদীসসমূহ :

১। মহানবী বলেছেন, ‘যদি কোন ব্যক্তি মুমিন ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি পৃথিবীতে ঐ মৃত ব্যক্তির পরিচিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে মহান আল্লাহ মৃত ব্যক্তির আত্মাকে তার সালাম ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের জবাব দানের জন্য সজাগ করেন।’[৫৫]

২। মহানবী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি তার জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের পদধ্বনি শুনতে পায়। [৫৬]

৩। ইবনে কাইয়্যেম জাওযীয়া তাঁর আররুহ গ্রন্থে বলেছেন, 'সাহাবিগণ ও প্রাচীন আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি তার জিয়ারতকারী ব্যক্তিকে চিনতে পারে এবং তার আগমনে আনন্দিত হয়। [৫৭]

৪। ইবনে আবিদ দুনিয়া তাঁর 'আল কুবুর' গ্রন্থে হযরত আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন, মহানবী বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি তার মুমিন ভ্রাতাকে জিয়ারত করে অর্থাৎ তার কররের নিকটে যায় ও সেখানে বসে, তবে মৃত ব্যক্তি তার সাহচর্যে আনন্দিত হয় ও তার সালামের উত্তর দেয়, ততক্ষণ তার সাহচর্য অনুভব করে যতক্ষণ না সে সেখান হতে উঠে চলে যায়।[৫৮]

৫। আবু হুরাইরা মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি মৃতের কবরের পাশ দিয়ে যায় ও তাকে সালাম দেয় তখন মৃত ব্যক্তি তাকে চিনতে পারে ও তার সালামের জবাব দান করে। [৫৯]

৬। বায়হাকী সাঈদ ইবনে মুসাইয়ের হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)- এর সঙ্গে মদীনায় কবরস্থানে পৌঁছলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'হে কবরবাসী! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের সংবাদ আমাদের জানাও নতুবা আমাদের খবর শোন।'সাঈদ বলেন, 'তখন তাদের কণ্ঠ শুনতে পেলাম : ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইয়া আমীরাল মুমিনীন! আমাদেরকে আপনাদের সংবাদ জানান। হযরত আলী (আ.) বললেন, 'তোমাদের স্ত্রীরা অন্য স্বামী গ্রহণ করেছে, তোমাদের সম্পদ উত্তরসূরিদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। তোমাদের সন্তানরা ইয়াতীমদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তোমাদের নির্মিত গৃহগুলোতে তোমাদের শত্রুরা বাস করছে। আমাদের নিকট এই হলো খবর। তোমাদের কী খবর?'সাঈদ বলেন, 'এক মৃত ব্যক্তি বলল যে, তার কাফনের কাপড় ছিন্নভিন্ন হয়েছে, তার চুলগুলো ঝরে পড়েছে, চর্ম দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, চক্ষু

অক্ষিকোটর হতে বেরিয়ে মুখের উপর ঝুলে পড়েছে, নাকের ছিদ্র হতে গলিত রস বেরিয়ে আসছে। যা এখানকার জন্য প্রেরণ করেছিলাম তা পেয়েছি এবং করণীয় যা করি নি তার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি।[৬০]

ইবনে কাইয়্যেম জাওযিয়া মৃত ব্যক্তিরা জীবিত ব্যক্তি কর্তৃক তার কবর জিয়ারতকে অনুভব করতে পারে কিনা প্রসঙ্গে বলেন, 'মৃত ব্যক্তির কবর জিয়ারতকারীকে 'জায়ের'(সাক্ষাৎকারী) বলা হয়, এর অর্থ মৃত ব্যক্তি তার সাক্ষাৎকারীকে চিনে নতুবা তাকে 'জায়ের' বলা হতো না।[৬১]

৭। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরের ভিতর শোয়ানো হয়, তখন সে তাকে দাফন করতে আসা ব্যক্তিদের পদধ্বনি শুনতে পায়।'[৬২]

৮। আবু হুরাইরা বলেছেন, 'মহানবী (সা.) যখনই কবর জিয়ারতে যেতেন এরূপে কবরবাসীদের সম্বোধন করতেন , [৬৩]

السلام عليكم اهل الديار من المومنين و المسلمين و انا ان شاءالله بكم لاحقون اسال الله لنا ولكم العافية

৯। ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'এক সাহাবী একটি কবরের নিকট তাঁবু পাতলেন, কিন্তু জানতেন না সেটি একটি মৃত ব্যক্তির কবর। হঠাৎ করে তাঁর কানে 'সূরা মুল্ক' তেলাওয়াতের শব্দ আসল। সূরা পাঠ শেষ হওয়া পর্যন্ত তা তাঁর কানে ভেসে আসছিল। পরবর্তীতে তিনি রাসূল (সা.)- এর নিকট পৌঁছে ঘটনাটি খুলে বললেন। মহানবী বললেন, 'সূরা মুল্ক কবরের আজাবের প্রতিরোধক এবং মানুষকে কবরের আজাব হতে মুক্তি দেয়।[৬৪]

কবরে বা বারজাখে নবিগণের জীবন

নবিগণের বারজাখী জীবন সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস :

১. আনাস ইবনে মালিক মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, 'নবিগণ তাঁদের কবরে জীবিত রয়েছেন এবং নামায পড়েন।'এই হাদীসটি হাফিজ হাইসামী তাঁর 'মাজমায়ুজ জাওয়ায়িদ'[৬৫] গ্রন্থে এবং আল্লামা মানাভী তাঁর 'ফাইজুল ক্বাদীর'[৬৬] গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী[৬৭] হাদীসটির বিশুদ্ধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

২. মহানবী (সা.) বলেছেন : 'মৃত্যুর পর আমার অবগতি আমার জীবিতাবস্থার ন্যায়।'[৬৮]

৩. হযরত আলী (আ.) বর্ণনা করেছেন : 'এক বছর এক আরব বেদুইন রাসূলের কবরের নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কবরের ভিতর হতে জবাব এল : আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন।'[৬৯]

৪. দারেমী তাঁর সুনান গ্রন্থে সাঈদ ইবনে আবদুল আজিজ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূল (সা.)- এর কবরের মধ্যে হতে জিকরের শব্দ শুনে নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে বুঝতে পারতেন।[৭০]

দারেমী সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াযীদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক মদীনার হত্যা ও লুণ্ঠনের দিনগুলোতে তিনি মহানবীর কবর হতে আজান শুনেছেন, আর মসজিদ তখন লোকশূন্য ছিল।[৭১]

৫। হাফিজ হাইসামী সহীহ সূত্রে আবূ হুরাইরা হতে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন : 'সেই সত্তার কসম আবুল কাসেম মুহাম্মদের জীবন যাঁর হাতে নিবদ্ধ, ঈসা ইবনে মারিয়াম ন্যায়বিচারক ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন। তিনি ক্রুশসমূহ নিশ্চিহ্ন করবেন, শুকরসমূহ হত্যা করবেন, সকল কিছুর সংস্কার সাধন করবেন, মানুষের মধ্যে বিদ্যমান শত্রুতার অবসান ঘটাবেন, প্রচুর সম্পদ দান করবেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমার কবরে এসে আমাকে সম্বোধন করে জবাব না পাবেন, ততক্ষণ তাঁকে কেউ গ্রহণ করবে না।'[৭২]

৬. হাফিজ হাইসামী সহীহ হাদীস সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন : 'আমার জীবিতাবস্থা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এ জন্য যে, আমার হতে হাদীস শোন ও বর্ণনা কর। আমার মৃত্যু তোমাদের জন্য কল্যাণকর এ কারণে যে, তোমাদের কর্মসমূহ (আমলনামা) আমার কাছে উপস্থাপন করা হবে এবং আমি তোমাদের সৎকর্ম দেখে আল্লাহর শোকর আদায় করব এবং তোমাদের মন্দ কর্মের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব।'[৭৩]

ইউসুফ ইবনে আলী জানানী মদীনাবাসী হাশেমী বংশের এক নারী হতে বর্ণনা করেছেন যে, মসজিদের কোন কোন খাদেম তাকে জ্বালাতন করত। তিনি মহানবীর সাহায্য প্রার্থনা করলে তাঁর পবিত্র কবর হতে শুনতে পেলেন : 'আমি ধৈর্যের ক্ষেত্রে তোমার আদর্শ। তাই ধৈর্যধারণ কর।' কয়েকদিন পর আপনা আপনিই সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেল এভাবে যে, তারা সকলেই মারা গেল।[৭৪]

বারজাখী জীবনে আল্লাহর ওলীদের মর্যাদা

হাকিম নিশাবুরী ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন: একদিন মহানবী (সা.) বসেছিলেন এবং আসমা বিনতে উমাইস তখন তাঁর নিকটেই ছিলেন। হঠাৎ করে মহানবী (সা.) কারো সালামের জবাব দিলেন। (আসমা আশ্চর্যান্বিত হলে) তিনি বললেন : 'হে আসমা! জাফর, জীবরাঈল ও মিকাঈলের সাথে আমাদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম দিয়েছিলেন।'[৭৫]

কাজী সুবুকী বলেছেন : 'আল্লাহর ওলিগণ তাঁদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর আল্লাহর ইচ্ছায় ও শক্তিতে কোন কিছুর উপর প্রভাব রাখেন। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে এ মর্যাদা দিয়েছেন ও তাঁদের হাত ও মুখের মাধ্যমে বিভিন্ন (অলৌকিক) কর্ম সম্পাদন করান।'[৭৬]

মৃতদের জন্য কোরআন পাঠ করা

ইবনে কাইয়্যেম জাওযিয়া বলেছেন : 'পূর্ববর্তীদের (সাহাবী, তাবেয়ীন ও অগ্রবর্তী আলেমদের) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা মৃত্যুর পূর্বে তাঁদের কবরের পাশে কোরআন তেলাওয়াতের অসিয়ত করতেন।'[৭৭]

বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর অসিয়ত করে যান তাঁর কবরের পাশে সূরা বাকারা পাঠ করার। আহমাদ ইবনে হাম্বাল প্রথমদিকে এ কর্মকে বৈধ মনে করতেন না, পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন।

খাল্লাল তাঁর 'আল ক্বিরাআত ইনদাল কুবুর' গ্রন্থে স্বীয় সূত্রে আলা ইবনে লাহলাজ হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা অসিয়ত করে যান : 'যখন আমাকে কবরে রাখবে তখন বলবে

بسم الله وعلي سنّة رسول الله

অতঃপর যখন আমাকে মাটি দ্বারা আবৃত করবে তখন আমার শিয়রে বসে সূরা বাকারা পাঠ কর, যেমনটি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বলেছেন।'[৭৮]

হাসান ইবেন সাব্বাহ জাফারানী বলেছেন : 'জনাব শাফেয়ীর কাছে মৃত ব্যক্তির কবরের নিকট কোরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, এতে কোন সমস্যা নেই।'[৭৯]

খাল্লাল শা'বী হতে বর্ণনা করেছেন: 'যখন আনসারদের কেউ মৃত্যুবরণ করত তারা তার কবরের নিকটে যেতেন ও কোরআন পাঠ করতেন।'[৮০]

হাসান ইবনে জারভী বলেছেন : 'আমার ভগ্নীর কবরের নিকটে গিয়ে সূরা মুল্ক পড়েছিলাম। কয়েকদিন পর এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল যে, আমার ভগ্নীকে স্বপ্নে দেখেছে, সে বলছে, 'আমার ভ্রাতাকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। সে আমার কবরের নিকটে কোরআন পাঠ করেছে, তা হতে আমি লাভবান হয়েছি।'[৮১]

এক ব্যক্তি জুমুআর দিন তার মাতার কবরের নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করত। একদিন সূরা পাঠ ইয়াসীন পাঠ করে সকল কবরবাসীর রুহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করল। কয়েকদিন পর এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল: 'তুমি কি অমুক ব্যক্তি?' সে বলল : 'হ্যাঁ'। তখন ঐ ব্যক্তি বলল :

‘আমার এক কন্যা মৃত্যুবরণ করেছে। তাকে স্বপ্নে দেখলাম সে তার কবরে অত্যন্ত আনন্দিত অবস্থায় বসে আছে। আমি তাকে তার আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে, অমুক ব্যক্তি সকল কবরবাসীর উদ্দেশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করার কারণে আমরা আল্লাহর শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করেছি।’[৮২]

ইয়াসায়ী বর্ণনা করেছেন রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের মৃতদের উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ কর।’[৮৩]

মুফাজ্জাল ইবনে মুয়াফফাক বলেছেন : ‘আমি প্রতিদিন আমার পিতার কবর জিয়ারত করতাম। একদিন বিশেষ ব্যস্ততার কারণে তাঁর কবর জিয়ারতে যেতে পারি নি। ঐদিন রাতে তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি আমাকে বলছেন : হে পুত্র! কেন আমার জিয়ারতে আস নি? আমি বললাম : আপনি কি আপনার কবর জিয়ারতে আসলে বুঝতে পারেন? তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ! যখন তুমি আমার কবরের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হও তখন হতে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে পর্যবেক্ষণ করি।’[৮৪]

মুজাহিদ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ‘মৃত ব্যক্তিকে কবরে তার সন্তানের সৎকর্ম সম্পর্কে জানানো হয়।’[৮৫]

ইবনে কাইয়েম জাওযিয়া বলেছেন, ‘উপরিউক্ত বিষয়ের সপক্ষে একটি উত্তম দলিল হলো প্রাচীনকাল হতেই মানুষ মৃতদের কবরে শয়ন করানোর পর তালক্বীন (ঈমানের বিষয়সমূহ আবৃত্তির মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেয়া) করে আসছে। যদি মৃতরা শুনতে না পেত ও এর মাধ্যমে লাভবান না হতো তবে তালক্বীন অনর্থক পরিগণিত হতো।[৮৬]

আহমাদ ইবনে হাম্বালকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি তা করার নির্দেশ দেন ও এটি উত্তম বলে উল্লেখ করেন।

সুয়ূতী তাঁর ‘শিফাউস্ সুদুর’ গ্রন্থে বলেন : ‘কোরআন তেলাওয়াতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে কিনা এ বিষয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে। পূর্বেকার আলেমগণের অধিকাংশ এবং চার মাযহাবের প্রবক্তাদের হতে তিনজন এ বিষয়ে একমত যে, সেই সওয়াব তাদের নিকট পৌঁছে।

কেবল ইমাম শাফেয়ী এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন এ যুক্তিতে যে, পবিত্র কোরআন বলছে :

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾

"*মানুষ তাই পায় যা সে করে।*" [৮৭] কিন্তু অন্যরা এর জবাবে নিম্নোক্ত দলিলসমূহ উপস্থাপন করেন :

প্রথমত উপরিউক্ত আয়াত নিম্নোক্ত এ আয়াতের

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ﴾

"*এবং যারা ঈমান এনেছে ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা ঈমানে তাদের অনুগামীমাধ্যমে - রহিত হয়ে গিয়েছে।*" [৮৮]

দ্বিতীয়ত পূর্বোক্ত আয়াতটিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত মূসা (আ.)- এর জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে ও তাদের মধ্যেই নির্দিষ্ট।

তৃতীয়ত আয়াতটিতে انسان বলতে শুধু কাফেরকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু মুমিনগণ নিজেদের সৎকর্ম ছাড়াও তার জন্য প্রেরিত দোয়ার দ্বারা লাভবান হয়ে থাকে।

চতুর্থত আয়াতটির উদ্দেশ্য হল মানুষকে তার প্রচেষ্টা ও কর্ম অনুযায়ী ফলদান যা ন্যায় বিচারের দাবী। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহের কারণে অন্যভাবেও মৃতব্যক্তির প্রতি সওয়াব পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকেন।

পঞ্চমত للانسان শব্দটিতে 'على' ' لام ' অর্থে এসেছে অর্থাৎ অসৎকর্মের ক্ষেত্রে একের শাস্তি অপর কেউ পাবে না কিন্তু সৎকর্মের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে আল্লাহর অনুমতিক্রমে নিয়তের অনুবর্তী। [৮৯]

মৃতের উপকৃত হওয়া

পবিত্র কোরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ হতে বোঝা যায় মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন তেলাওয়াত ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে তা হতে তারা লাভবান হয়।

১। আয়াতসমূহ

মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾

“যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে তারা তাঁদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তাআপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। ! অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।” [৯০]

অন্যত্র বলেছেন :

﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾

“যখন নিকট আকাশ উপর হতে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।” [৯১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾

“যারা তাদের পরে আগমন করেছে তাদের জন্য দোয়া করে তারা (আনসাররা) বলে : হে আমাদের পালনকর্তা!, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করুন। ” [৯২]

২। হাদীসসমূহ

বিভিন্ন হাদীস হতেও জানা যায় মৃতগণ জীবিতদের সৎকর্মের প্রেরিত সওয়াব হতে লাভবান হয়ে থাকে। সহীহ বুখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা হতে বর্ণনা করেছে রাসূল (সা.) বলেছেন : ‘যদি কোন মৃত ব্যক্তির রোজা কাযা থাকে তবে তার পক্ষে তার ওয়ালী (সন্তান বা এরূপ অন্য কেউ) কাযা আদায় করবে।’[৯৩]

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ‘এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)- এর নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তার উপর এক মাসের কাযা রোজা ফরজ ছিল। আমি কি তার পক্ষে তা আদায় করতে পারব? মহানবী (সা.) বললেন, ‘হ্যাঁ, দ্বীনের বিধান আদায় করাটাই বাঞ্ছিত।’[৯৪]

অন্য এক হাদীসে এসেছে এক নারী মহানবীর নিকট প্রশ্ন করল : আমার মাতা হজ্জ্ব না করেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমি কি তার পক্ষে তা আদায় করতে পারব? তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ, তার পক্ষে তা আদায় কর।’[৯৫]

আতা ইবনে রিবাহ বর্ণনা করেছেন : এক ব্যক্তি মহানবীকে জিজ্ঞেস করল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার মৃত মাতার পক্ষে দাস মুক্ত করতে পারব? মহানবী (সা.) বললেন : ‘হ্যাঁ, পুনরায় সে বলল, ‘এই দাস মুক্তির সওয়াব হতে সে কি লাভবান হবে?’তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’।

সাদ ইবনে উবাদা রাসূলকে প্রশ্ন করলেন, ‘আমার মাতা জীবিতাবস্থায় মানত করেছিলেন কিন্তু পালন করতে পারেন নি। আমি কি তার মানতটি পালন করব? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’। সাদ পুনরায় বললেন, ‘এর মাধ্যমে তিনি কি লাভবান হবেন? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’।

আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসুলের নিকট এসে বলল, ‘আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু তার সম্পদের জন্য কোন ওসিয়ত করে যাননি। আমি যদি তার পক্ষে সাদকা দান করি তবে তা কি তার গুনাহের কাফফারা হিসেবে পরিগণিত হবে? তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ।’মহানবী আরো বললেন : ‘তোমাদের মৃতদের জন্য সূরা ইয়াসীন পাঠ কর।’[৯৬]

ওয়াহাবীদের উপস্থাপিত দলিলের পর্যালোচনা

প্রথম দলিল

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি ওয়াহাবীরা তাদের মতের সপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসটি উপস্থাপন করে থাকে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন : 'যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন তার সকল সৎকর্ম বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ব্যতীত যথা সাদকায়ে জারীয়া (মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, হাসপাতাল, ইয়াতিম খানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা), তার রেখে যাওয়া যে জ্ঞান হতে অন্যান্যরা লাভবান হয় এবং সৎকর্মশীল (নেক) সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।

তারা উপরিউক্ত হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায় মৃত্যুর মাধ্যমে এ পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে তারা এ পৃথিবী হতে কোন কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না এবং এ পৃথিবীতে তারা কোন প্রভাবও রাখতে সক্ষম নন।

আমাদের উত্তর

উপরিউক্ত হাদীসটিতে তিনটি কর্ম ব্যতীত মৃতব্যক্তি নিজের জন্য অন্য কোন কর্ম করতে পারে না বলা হয়েছে অর্থাৎ যে কর্মসমূহ মৃতব্যক্তি তার জীবদ্দশায় পরবর্তী জীবনের জন্য করতে পারত তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঐ তিনটি ব্যতীত অন্য কোন কর্মের সওয়াব সে অনবরত লাভ করতে পারবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোন ব্যক্তি তার পক্ষে কোন কাজ করলে তা হতে সে লাভবান হবে না বরং অন্য কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর তার নিয়তে কোন সৎকর্ম করলে সে সওয়াব পেতে পারে। কারণ তা তার নিজ কর্মের উপর নির্ভরশীল নয়।[৯৭]

দ্বিতীয় দলিল

পবিত্র কোরআনের কোন কোন আয়াত হতে বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় মৃতরা শুনতে পায় না। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾

“সুতরাং নিশ্চয়ই (হে নবী!) তুমি মৃতদের (যাদের অন্তর মৃত) শোনাতে সক্ষম নও এবং বধিরদের কর্ণেও তা পৌঁছাতে সক্ষম নও যখন তারা(নিজেরাই) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।” [৯৮]

অন্য আয়াতে এসেছে :

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

“অবশ্যই জীবিত ও মৃত সমান নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান শোনান। তুমি যে ব্যক্তি কবরে আছে তাকে শোনাতে সক্ষম নও।” [৯৯]

আমাদের উত্তর

প্রথমত উপরিউক্ত আয়াতের লক্ষ্য কবরে শায়িত প্রাণহীন দেহ হতে পারে যা মাটিতে পরিণত হয়েছে ফলে কোন কিছু বুঝতে সক্ষম নয়।

দ্বিতীয়ত শুনতে সক্ষম নয় অর্থ কোন কল্যাণ অর্জনে সক্ষম নয় হতে পারে যা বধিরতার সমার্থক বলা হয়েছে। ফলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই মুশরিক পৌত্তলিকরা কোরআনের আয়াত শোনে কিন্তু তা হতে কোন কল্যাণ লাভ করে না যেমন কবরে শায়িতরা তোমার কথা শুনে কিন্তু কোন কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না। কারণ তাদের সময় (কল্যাণ লাভের সুযোগ) শেষ হয়ে গেছে।

ইবনে কাইয়্যেম জাওযিয়া وما أنتَ بِمُسمعٍ من فى القبور আয়াতটির তাফসীরে বলেছেন : আয়াতটির লক্ষ্য সে সকল কাফের যাদের অন্তর মৃত, ফলে (হে নবী!) তুমি তাদের কর্ণে সত্যকে পৌঁছাতে সক্ষম নও যা হতে তারা লাভবান হতে পারে। যেমন কবরে শায়িতদের এমনভাবে শোনাতে সক্ষম নও যা হতে কল্যাণ লাভ করতে পারে।

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

ইবনে কাইয়্যেম এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন তাদের শ্রবণের অক্ষমতা এ অর্থে : যে, যেহেতু মুশরিকদের অন্তর মৃত সেহেতু তুমি সত্যকে তাদের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম নও যেমনটি মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।’[১০০]

হাসান ইবনে আলী সাক্কাফ আশশাফেয়ী و ما أنت بمسمعٍ من فى القبور আয়াতটির তাফসীরে বলেছেন : ‘আয়াতটির লক্ষ্য সে সকল কাফের যারা বাতিলের পথে একগুয়েমি প্রদর্শন করে।

ফলে তোমার উপদেশ হতে লাভবান হয় না যেমন কবরে শায়িতরা তোমার উপদেশ হতে কল্যাণ পায় না। অতঃপর তিনি তাফসীরে সাবুনী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতটির অর্থ হল যেমনভাবে মৃত কাফিররা তোমার হেদায়েত ও আহ্বান হতে কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না দূর্ভাগা মুশরিকরাও তেমনি তোমার সৎপথ প্রদর্শন হতে লাভবান হয় না।[১০১]

﴿إنک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء﴾

আয়াতটির তাফসীরে তিনি বলেছেন : 'এর অর্থ হে নবী! যার অন্তরে বাতিলের মোহর অঙ্কিত হয়েছে তার নিকট তুমি সত্য পৌঁছাতে সক্ষম নও, কারণ তারা নিজেরাই সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।[১০২]

কবর জিয়ারত

ইসলামী ইতিহাসের পরিক্রমায় মুসলমানগণ কবর জিয়ারতকে শুধু বৈধই মনে করেন নি; বরং আল্লাহর ওলীদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশে সফরকে মুস্তাহাব জানেন এবং এ বিষয়ে তাদের মধ্যে ইজমা শারয়ী) ঐকমত্যরয়েছে। কিন্তু প্রথমবারের মতো এ বিষয়টিকে ইবনে তাইমিয়া (নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করেন এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে হারাম বলে ফতোয়া দেন। তার পরবর্তীকালে তার শিষ্য ও চিন্তার প্রচারকগণ এ ফতোয়ার পক্ষাবলম্বন করেন এবং তা প্রতিষ্ঠার আবদুল ব্রত নেন। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহাব ও তার অনুসারীরা কবর জিয়ারতকে হারাম বলে মনে করে এবং এ ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। যেহেতু এ বিষয়টির বিশেষ ধর্মীয় প্রভাব রয়েছে সেহেতু বিষয়টির বৈধতার বিষয়ে আমরা এখানে পর্যালোচনা করব।

কবর জিয়ারত সম্পর্কে ওয়াহাবীদের ফতোয়া

১। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, ‘মহানবী (সা.) হতে বর্ণিত কবর জিয়ারত সম্পর্কিত সকল হাদীস শুধু জাইফই (দুর্বল) নয় বরং জাল ও বানোয়াট।’[১০৩]

আসকালানী ইবনে তাইমিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, ‘তিনি একচেটিয়াভাবে নবী ও ওলীদের কবর জিয়ারতকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এমনকি নবী ও ওলীদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা ও এজন্য প্রস্তুতি গ্রহণকেও নিষিদ্ধ বলেছেন।’[১০৪]

ইবনে তাইমিয়া তাঁর ‘আত তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসিলাহ’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘কবর জিয়ারত সম্পর্কিত মহানবী (সা.) হতে বর্ণিত হাদীস দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। এ কারণেই সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও সুনান লেখকদের কেউই এই হাদীসগুলি বর্ণনা করেন নি। তাঁদের মধ্যে যারা জাইফ (দুর্বল) হাদীস বর্ণনায় অভ্যস্ত তাঁরাই কেবল এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যেমন দারে কুতনী, বাজ্জার ও অন্যান্যরা।’[১০৫]

তিনি অন্যত্র বলেছেন, ‘কবর জিয়ারত সম্পর্কিত মহানবীর সকল হাদীস দুর্বলই শুধু নয় মিথ্যা ও বানোয়াটও বটে।’[১০৬]

২। আবদুল আজীজ ইবনে বিজবায বলেছেন, ‘সকলের জন্য জিয়ারত বিশেষত মহানবী (সা.) ও তাঁর সঙ্গে শায়িত দুই সঙ্গীর (সাহাবী) কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব। কিন্তু জিয়ারতের নিয়ত করা এবং জিয়ারতের নিয়তে সফর ও সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা কবর জিয়ারত কর, কারণ তা তোমাদের আখেরাতের (ও মৃত্যুর) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা বৈধ নয়।’[১০৭]

৩। ওয়াহাবীদের ফতোয়া ও ধর্মীয় বিধি- বিধান সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য গঠিত স্থায়ী কমিটি তাদের একটি ফতোয়ায় এভাবে বলেছেন, ‘আল্লাহর নবিগণ ও সৎকর্মশীল বান্দাসহ অন্যান্য মুসলমানের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা বৈধ নয়। বরং তা বিদআত বলে পরিগণিত।’[১০৮]

উপরিউক্ত ফতোয়াসমূহ হতে বোঝা যায়, কবর জিয়ারতের বৈধতার বিষয়ে ওয়াহাবীদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। ওয়াহাবী চিন্তাধারার পথিকৃত ইবনে তাইমিয়া সম্পূর্ণরূপে কবর জিয়ারতকে নিষিদ্ধ বলেছেন। কিন্তু একই ধারার সাম্প্রতিক আলেমগণ কবর জিয়ারতকে ঐ ক্ষেত্রে অবৈধ ও বিদআত বলেছেন যখন কেউ তার বাসস্থান হতে কবর জিয়ারতের নিয়তে বের হবে। কিন্তু যদি কেউ হজ্জ্ব করতে যেয়ে মহানবীর কবরও জিয়ারত করে আসে তবে সেক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই।

পবিত্র কোরআন ও কবর জিয়ারত

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত বিবরণ হতে আল্লাহর ওলীদের কবর জিয়ারত বৈধ ও মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা যায়। আমরা এখানে এরূপ কয়েকটি আয়াতের প্রতি ইশারা করব।

১। মহান আল্লাহ মহানবীকে মুনাফিকদের কবরের নিকট দণ্ডায়মান হতে নিষেধ করে বলেছেন: وَ لا تقم على قبره "আপনি তাদের (মুনাফিকদের) কবরের নিকট দণ্ডায়মান হবেন না।"

উপরিউক্ত আয়াতটিতে মুনাফিকদের ব্যক্তিত্ব ও মূল্যহীনতার দিকে লক্ষ্য করে তাদের মৃত্যুর পর দাফনের মুহূর্তে অথবা পরবর্তীকালে তাদের কবরের নিকট জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

বাইদ্বাভী তাঁর 'আনওয়ারুত্ তানযীল'[১০৯] গ্রন্থে এবং আলূসী তাঁর 'রুহুল মায়ানী'[১১০] তাফসীরে উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন তাদের কবরের নিকট দাঁড়ানোর অর্থ দাফনের সময় অথবা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে।

মুনাফিক ও কাফিরের কবরের নিকট জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ হওয়া হতে বোঝা যায় মুমিন ও মুসলমানের কবরের নিকট দাঁড়ানো ও তাদের জিয়ারত করা বৈধ এবং এতে কোন অসুবিধা নেই।

২। মহান আল্লাহ আসহাবে কাহফের বিষয়ে ও তাঁদের প্রতি মানুষদের সম্মান প্রদর্শনের ধরণ কী হওয়া উচিত তা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব হয়েছে তার উল্লেখ করে বলেছেন,

﴿إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾

"যখন তারা নিজেদের মধ্যে তাদের (সম্মান প্রদর্শনের) বিষয়ে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হল এবং তারা (একদল) বলেছিল : তাদের (কবরের) উপর সৌধ নির্মাণ করব। তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয়ে অধিক অবগত। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল : আমরা অবশ্যই তাদের উপর (কবরস্থানে) মসজিদ নির্মাণ করব।" (সূরা কাহফ : ২১)

মুফাসসিরগণ বলেছেন, ‘অনেকের মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব হতে বোঝা যায় তারা মুসলমান ও একত্ববাদী ছিল। তাদের মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাবও এ লক্ষ্যে ছিল যে, সবসময় যেন লোকজন সেখানে যায় এবং তাদের (আসহাবে কাহফ) মাজারও জিয়ারতের স্থানে পরিণত হয়।’

কবর যিয়ারত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

মহানবী (সা.) কবর জিয়ারতের কেবল নির্দেশই দান করেন নি, বরং তিনি নিজেও কবর জিয়ারতে যেতেন যাতে করে এ বিষয়টি জায়েয ও মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হয়। আমরা তাই কবর জিয়ারতের বৈধতার বিষয়টি হাদীস এবং মহানবীর অনুসৃত কর্ম (সীরাত) উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই পর্যালোচনা করছি।

ক) **হাদীসসমূহে কবর জিয়ারতের বৈধতার দলিল** : ইসলামী শরীয়তে কবর জিয়ারত বৈধ হওয়ার বিষয়টিতে তিনটি পর্যায় লক্ষণীয়।

প্রথম পর্যায় : এ পর্যায়ে পূর্ববর্তী শরিয়তের বৈধতার বিষয়টিই বহাল ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায় : ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোন কোন গোষ্ঠী বিশেষত আহলে কিতাবের অনুসারীদের শিরক বা অংশীবাদমিশ্রিত বিশ্বাস যা তারা তাদের মৃত ঐশী ব্যক্তিবর্গের বিষয়ে পোষণ করত (যেমন কবরের উপর সিজদা করা) রোধ করার লক্ষ্যে তৎকালীন সময়ের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়।

তৃতীয় পর্যায় : এই পর্যায়ে পুনরায় কবর জিয়ারতকে বৈধ (জায়েয) করা হয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আমি তোমাদের জন্য কবর জিয়ারতকে নিষিদ্ধ করেছি, কিন্তু এখন হতে তা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল তবে জিয়ারতের সময় এমন কথা বলো না যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।'[১১১]

খ) মহানবী (সা.)- **এর অনুসৃত কর্মপদ্ধতিতে কবর জিয়ারত**:

১। বুরাইদা আসলামী মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : 'আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু আমাকে আমার মাতার কবর জিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তোমরা তোমাদের মৃতদের কবর জিয়ারত কর। কারণ তা তোমাদের আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১১২]

২। হাকিম নিশাবুরী বুরাইদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী সহস্র ফেরেশতাসহ তাঁর মাতার কবর জিয়ারত করেন। সেদিনের ন্যায় এত অধিক ক্রন্দন করতে আমি তাঁকে কখনোই দেখি নি।[১১৩]

আবু হুরাইরা বলেছেন, 'মহানবী (সা.) তাঁর মাতার কবর জিয়ারত করার সময় এতটা ক্রন্দন করেছিলেন যে, অন্যরা তাঁর কান্নায় প্রভাবিত হয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল।'[১১৪]

৩। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্ বলেছেন, 'আমরা রাসুলের সাথে শহীদদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা হতে বের হলাম। যখন আমরা 'হাররে ওয়াকিম' নামক স্থানে পৌঁছালাম কয়েকটি কবর লক্ষ্য করে তাঁকে বললাম : হে আল্লাহর নবী! এগুলো কি আমাদের মুসলিম ভ্রাতাদের কবর? তিনি বললেন : এ কবরগুলো আমার সাহাবীদের। যখন আমরা শহীদদের কবরের নিকট পৌঁছালাম তিনি বললেন : এ কবরগুলো আমাদের ভ্রাতৃবর্গের।'[১১৫]

৪। মুসলিম হযরত আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) শেষ রাত্রে জান্নাতুল বাকীর গোরস্তানে যেয়ে এভাবে সালাম করতেন 'আস্ সালামু আলা দারে কাওমি মুমিনীন।'[১১৬]

৫। ইবনে আবি শাইবাহ বলেছেন, 'মহানবী (সা.) প্রতি বছরের শুরুতে ওহুদের শহীদদের কবরের নিকটে গিয়ে এভাবে সালাম দিতেন, 'আসসালামু আলাইকুম বিমা সাবারতুম ফানি' মা উকবাদ্দার।'[১১৭]

গ) **পূর্ববর্তীগণের জীবন ও কর্মধারায় কবর জিয়ারত** : সাহাবী, তাবেয়ী ও ইসলামী উম্মাহর আলেমগণের জীবন ও কর্মধারায় আমরা কবর জিয়ারতের প্রচলন লক্ষ্য করি। এখানে আমরা এরূপ ব্যক্তিবর্গের এরূপ কর্মের নমুনা পেশ করছি।

১। হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আ.) **ও কবর জিয়ারত** : হাকিম নিশাবুরী তাঁর নিজস্ব সনদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মহানবীর জীবদ্দশায় প্রতি শুক্রবার হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের (ওহুদের যুদ্ধে শহীদ রাসূলের চাচা) কবর জিয়ারতে যেতেন। সেখানে নামাজ পড়তেন এবং ক্রন্দন করতেন।[১১৮]

২। **খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব এবং কবর জিয়ারত** : মুহিবুদ্দিন তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জে যাওয়ার সময় পথে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তার কাছে সাহায্য চাইল। তিনি হজ্ব হতে ফেরার সময় ঐ স্থানে পৌঁছে উপরিউক্ত ব্যক্তির খোঁজ খবর জানতে চাইলেন। তাকে বলা হলো সে মৃত্যুবরণ করেছে। এ কথা শুনে তিনি দ্রুত তার কবরের নিকট যেয়ে নামাজ পড়লেন ও সেখানে বসে ক্রন্দন করলেন।[১১৯]

৩। **হযরত আয়েশা ও কবর জিয়ারত** : ইবনে আবি মালিকা বলেছেন : একদিন হযরত আয়েশা কবরস্থানে প্রবেশ করলেন আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম : কেন কবরস্থানে প্রবেশ করছেন? তিনি বললেন : আমার ভাই আবদুর রহমানের কবর জিয়ারত করতে। আমি বললাম : মহানবী (সা.) কি কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেন নি? তিনি বললেন : তিনি নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু পরে অনুমতি দিয়েছেন।[১২০]

৪। **হযরত আলী** (আ.) **ও কবর জিয়ারত** : খাব্বাব ইবনে আরত প্রাথমিক মুসলমানদের একজন তিনি কুফায় বসবাসকালীন সময়ে গুরুতর অসুস্থতার কারণে হযরত আলীর সঙ্গে সিফিফনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। যখন ইমাম আলী (আ.) সিফিফন হতে ফিরে এসে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনলেন তখন তাঁর কবরের নিকট গিয়ে জিয়ারত করলেন।[১২১]

৫। **মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়াহ ও কবর জিয়ারত**: ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) শাহাদাত বরণের পর মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়াহ তাঁর কবরের নিকট পৌঁছলে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে আসল। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হলে তিনি ইমাম হাসানের প্রশংসা করতে লাগলেন।[১২২]

৬। **আবু খাল্লাল ও কবর জিয়ারত** : স্বীয়যুগে হাম্বলী ফিকাহর ইমাম আবু খাল্লাল বলেছেন, 'যখনই আমি কোন সমস্যায় পড়তাম হযরত মূসা ইবনে জাফরের (আ.) নিয়ত করতাম এবং তাঁর উসিলায় আল্লাহর নিকট চাইতাম। আল্লাহর ইচ্ছায় আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।'[১২৩]

৭। **ইবনে খোজাইমা ও কবর জিয়ারত** : আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুয়াম্মাল বলেছেন : আহলে হাদীসের ইমাম আবি বাকর ইবনে খোজাইমা, ইবনে আলী সাকতী ও স্বনামধন্য

কয়েকজন আলেমের সঙ্গে হযরত আলী ইবনে মূসা আর রেজার কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। লক্ষ্য করলাম ইবনে খোজাইমা এমনভাবে আলী ইবনে মূসার কবরের প্রতি সম্মান ও বিনয় প্রদর্শন করলেন যে, আমরা হতভম্ব হলাম।[১২৪]

আহলে সুন্নাতের আলেমদের ফতোয়া

১। ইবনে ইদ্রিস শাফেয়ী বলেছেন : 'কবর জিয়ারতে কোন সমস্যা নেই। তবে জিয়ারতের মুহূর্তে এমন কিছু বলা যাবে না যাতে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।'[১২৫]

২। হাকিম নিশাবুরী বলেছেন : 'কবর জিয়ারত মুস্তাহাব সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।'[১২৬]

৩। শেখ মানুসর আলী নাসেফ বলেছেন : 'আহলে সুন্নাতের আলেমদের দৃষ্টিতে কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব।[১২৭]

৪। ইবনে হাজম, আবু হামিদ গাজ্জালী এবং আবদুর রহমান জায়িরী হতে বর্ণিত হয়েছে তাঁরা মৃত ব্যক্তির জিয়ারতকে মুস্তাহাব মনে করতেন।[১২৮]

আল কোরআনের দৃষ্টিতে মহানবীর কবর জিয়ারত

মহানবীর কবর জিয়ারতের বৈধতার বিষয়টি প্রমাণকারী কয়েকটি আয়াত রয়েছে, যেমন :

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

“আর যদি তারা (মুনাফিকরা) নিজেদের উপর জুলুম করার পর তোমার (রাসূলের) নিকট আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত সেই সাথে রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তবে তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও দয়াবান হিসেবে পেত।” [১২৯] অবশ্য কোন কোন মুফাসসিরের মতে উপরিউক্ত আয়াত মহানবীর জীবদ্দশার সাথে জড়িত অর্থাৎ যেসব ব্যক্তি নিজের উপর অন্যায় করার পর তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে অন্যায় (গুনাহ) স্বীকার করে তাঁকে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানাত এবং তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। কিন্তু এ বিষয়টি মহানবীর মৃত্যুর পরও প্রমাণযোগ্য।

সাবকী তাঁর ‘শিফাউস সিকাম’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘যদিও আয়াতটি রাসূল (সা.)- এর জীবদ্দশার সাথে সম্পর্কিত তদুপরি মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর এ মর্যাদার পরিসমাপ্তি ঘটে নি। এ কারণে বলা যায় সকলের জন্যই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার এ পদ্ধতির সর্বজনীনতা রয়েছে, তাই আলেমগণ উপরিউক্ত আয়াত হতে সর্বজনীনতা বুঝে থাকেন এবং রাসূলের কবরের নিকট উক্ত আয়াত পাঠ করা মুস্তাহাব।[১৩০]

সাবকীর বক্তব্যে সর্বজনীনতার যে কারণটি উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যায় বলতে চাই গুনাহকারী ব্যক্তিকে রাসূলের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শটি তাঁর শাফায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং নিঃসন্দেহে তাঁর মৃত্যুর পরও গুনাহকারীদের জন্য এরূপ মাধ্যমের (স্বয়ং নবী অথবা আল্লাহর কোন ওলীর শাফায়াতের) প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবর জিয়ারতে যাওয়া ও তাঁর মধ্যস্থতায় আল্লাহর নিকট চাওয়ায় কোন সমস্যা নেই।

সুফিয়ান ইবনে আম্বার উতবা হতে (যাঁরা উভয়েই ইমাম শাফেয়ীর হাদীসের শিক্ষক) বর্ণনা করেছেন : আমি মহানবীর কবরের নিকট বসেছিলাম এ সময় একজন বেদুইন আরব রাসূল

(সা.)- এর কবরের নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর আমার সালাম। অতঃপর সূরা নিসার উপরিউক্ত আয়াতটি পাঠ করে বলল : হে নবী! আমি আপনার নিকট এসে আমার গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আল্লাহর নিকট আপনাকে শাফি (মধ্যস্থতা ও সুপারিশকারী) হিসেবে পেশ করছি। এ কথা বলে সে ক্রন্দন করতে লাগল এবং রাসূলের শানে কবিতা আবৃত্তি করল।[১৩১]

সামআনী একই রকম ঘটনা হযরত আলী হতে বর্ণনা করেছেন।[১৩২] তিনি বলেছেন, 'যদি এই কর্ম সঠিক ও বৈধ না হতো তবে সাহাবিগণ, বিশেষত হযরত আলী (আ.) ঐ স্থানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কেন নিষেধ করলেন না?[১৩৩]

হাদীসের দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)- এর কবর জিয়ারত

আহলে সুন্নাতের হাদীস গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায় যা রাসূলের কবর জিয়ারত মুস্তাহাব হওয়াকে প্রমাণ করে। এখানে এরূপ কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করছি।

১। দারে কুতনী সহীহ্ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হতে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে কেউ আমার কবর জিয়ারত করবে তার জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করা আমার জন্য আবশ্যক হবে।'[১৩৪]

২। দারে কুতনী সহীহ্ সূত্রে রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'যে কেউ হজ্জ্ব করার পর আমার কবর জিয়ারত করতে আসবে সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল।[১৩৫]

৩। বায়হাকী সহীহ্ সূত্রে আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে কেউ দুই হারামে (মক্কা ও মদীনায়) মৃত্যুবরণ করবে সে নিরাপত্তা লাভকারীদের (আল্লাহর আজাব হতে) অন্তর্ভুক্ত হিসেবে কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হবে এবং যে কেউ আমাকে ইখলাসের সাথে (নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর উদ্দেশ্যে) জিয়ারত করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকবে।'[১৩৬]

৪। ইবনে আদী আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে কেহ আল্লাহর ঘর (কাবা) জিয়ারত করল ও হজ্জ্ব সম্পাদন করল, কিন্তু আমার কবর জিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি অবিচার করল (অর্থাৎ আমার প্রতি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করল না।'[১৩৭]

৫। আনাস ইবনে মালিক মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'যে কেউ আমার মৃত্যুর পর আমাকে জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে জিয়ারত করল। যে কেউ আমার কবর জিয়ারত করল তার শাফায়াত (সুপারিশ) করা আমার জন্য কিয়ামতের দিন

অপরিহার্য হয়ে পড়বে এবং কোন স্বচ্ছল ব্যক্তি ও সুস্থ ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত হতে বিরত থাকলে তার জন্য কিয়ামতে কোন ওজরই গৃহীত হবে না।[১৩৮]

সাহাবীদের জীবন ও কর্মে রাসূল (সা.)- এর কবর জিয়ারত

আমরা সাহাবী, তাবেয়ী ও ইসলামের প্রথম সারির অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের কর্মধারায় মহানবীর কবর জিয়ারতের রীতি লক্ষ্য করি। এরূপ কয়েকটি নমুনা এখানে উপস্থাপন করছি।

১। **হযরত ফাতিমাতুজ যাহরা** (.আ) : হযরত আলী (আ.) বলেছেন : মহানবীর দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর ফাতিমা জাহরা (আ.) তাঁর পিতার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এক মুঠো কবরের মাটি নিয়ে নিজ চোখে স্পর্শ করলেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন [১৩৯] :

ماذا على من شمّ تربة احمد

ان لا يشمّ على الزمان غواليا

صبت عليَّ مصائب لو أنها

صبَّت على الايام عدن لياليا

২। **হযরত বেলাল** (.রা) : হযরত বেলাল রাসূল (সা.)- এর ইন্তেকালের পর সিরিয়ায় হিজরত করেন। একরাত্রে তিনি মহানবী (সা.)- কে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি তাঁকে বলছেন, 'হে বেলাল! আমার প্রতি দায়িত্বের ক্ষেত্রে এটি তোমার কিরূপ অবহেলা? তোমার কি আমাকে জিয়ারতের সময় আসে নি? হযরত বেলাল অস্থির হয়ে ঘুম থেকে জাগলেন ও দ্রুত প্রস্তুত হয়ে বাহনে আরোহণ করে মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। মদীনায় পৌঁছেই তিনি রাসূলের কবরের নিকট গিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন ও নিজের গণ্ডদেশ কবরের উপর রাখলেন।[১৪০]

৩। **আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর** : সামহুদী বর্ণনা করেছেন, 'আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর যখনই কোন সফর হতে ফিরতেন রাসূলের কবরের নিকট গিয়ে সালাম দিতেন।[১৪১]

৪। **হযরত আবু আইয়ুব আনসারী** : হাকিম নিশাবুরী বর্ণনা করেছেন, 'একদিন মারওয়ান ইবনে হাকাম মহানবীর কবরের নিকট গিয়ে দেখল এক ব্যক্তি রাসূলের কবরের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে (ও ক্রন্দন করছে)। মারওয়ান ঐ ব্যক্তির ঘাড় ধরে উঠিয়ে বলল, 'জান তুমি কি

করছ?’ কিন্তু পরক্ষণেই তাকিয়ে দেখল তিনি রাসূলের প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী। আবু আইয়ুব আনসারী তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমি কোন পাথরের নিকট আসি নি, আমি আল্লাহর রাসূলের নিকট এসেছি।[১৪২]

আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণের কবর জিয়ারত মুস্তাহাব হওয়ার দলিল

রাসূলের পবিত্র আহলে বাইতের ইমামগণ তাঁদের অনুসারীদের তাঁদের কবরসমূহ জিয়ারত করতে বলেছেন। এরূপ কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করছি।

১। শেখ তূসী ইমাম আলী ইবনে মূসা (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ‘প্রত্যেক ইমামেরই তাঁর অনুসারীদের উপর অধিকার ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি তাঁদের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে পূর্ণরূপে পালিত হয়।[১৪৩]

২। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইমাম বাকির (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ‘আমাদের অনুসারীদের ইমাম হুসাইন ইবনে আলীর কবর জিয়ারতের উপদেশ দিচ্ছি। কারণ প্রতিটি মুমিনের জন্য ইমাম হুসাইনের ইমামতের সাক্ষ্য প্রদান ও তাঁর স্বীকারোক্তি মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ওয়াজিব করা হয়েছে।’[১৪৪]

৩। আলী ইবনে মাইমুন বলেছেন, ‘ইমাম সাদিক (আ.) হতে শুনেছি, ‘যদি তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি এক হাজার বার হজ্জ্ব পালন করে, কিন্তু ইমাম হুসাইনের কবর জিয়ারত না করে, আল্লাহর অধিকারসমূহের একটি অধিকারকে পালন করে নি (অর্থাৎ ত্যাগ করেছ)।’এরূপ কেন হবে সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ‘প্রতিটি মুসলমানের উপর ইমাম হুসাইনের অধিকার রয়েছে।’[১৪৫]

কবর জিয়ারতের নিয়তে সফরের শরীয়তগত বৈধতা

পূর্বে আমরা ওয়াহাবী আলেমদের ফতোয়ার আলোচনায় উল্লেখ করেছি তাদের সাম্প্রতিক আলেমগণ কবর জিয়ারতকে বৈধ মনে করলেও কবর জিয়ারতের নিয়তে যাত্রাকে বৈধ ও জায়েয মনে করেন না, বরং একে ‘বিদআত’ বলে অভিহিত করেছেন, এমনকি যদি তা রাসূল (সা.)-এর কবর জিয়ারতের নিয়তেও হয়। তবে ইবনে তাইমিয়া কবর জিয়ারতকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফতোয়া দিয়েছেন।

এখন আমরা কবর জিয়ারতের নিয়তে (বিশেষত রাসূলের কবর জিয়ারত) সফরের শরীয়তগত (শারয়ী) বৈধতাকে প্রমাণ করব :

১। মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

আয়াতটিতে[১৪৬] ‘جاءوک’ বলা হয়েছে যাতে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল স্থান হতে রাসূলের নিকট গমনের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

২। যে হাদীসটিতে মহানবী (সা.) বলেছেন من زار قبری তাতে জিয়ারতের শব্দটিও নিকট ও দূরবর্তী উভয় স্থানকে শামিল করবে। বিশেষত যে হাদীসটিতে ইবনুস সাকান সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন তাতে উল্লেখও হয়েছে من جائنی زائراً অর্থাৎ যে আমার নিকটে আসবে জিয়ারতকারী হিসেবে যা জিয়ারতের সফরের প্রতিই ইঙ্গিত করছে। বাহ্যিকভাবে তা হতে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর বোঝা যায়।

৩। কোন কোন হাদীস হতে স্পষ্টভাবে অথবা বাক্যের ধরন হতে জিয়ারত মুস্তাহাব ও জায়েয হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়, এমনকি জিয়ারতের নিয়ত করা ও জিয়ারতের নিয়তে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সে উদ্দেশ্যে যাত্রার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়।

মুসলিম ও অন্যান্যরা সহীহ সনদে বুরাইদা আসলামী হতে বর্ণনা করেছেন মহানবী (সা.) বলেছেন : 'আমি তোমাদেরকে আমার কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু আমাকে আমার মাতার কবর জিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন হতে তোমরাও কবর জিয়ারত কর, তা তোমাদের আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।'[১৪৭]

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আমাকে আমার মাতার কবর জিয়ারত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে'- বাক্যটি হতে বোঝা যায় কোন স্থান হতে জিয়ারতের নিয়তে বের হতে কোন অসুবিধা নেই।

সামআনী ইমাম আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক আরব বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাফনের তিনদিন পর মদীনায় প্রবেশ করে সরাসরি তাঁর কবরের নিকট গিয়ে তাঁর কবরের উপর উপুড় হয়ে মাটি উঠিয়ে নিজের মাথার উপর ফেলতে লাগল এবং তাঁর উদ্দেশে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের উদ্দেশে বলেছেন এবং আমরাও আপনার কথা শুনেছি। আপনি আল্লাহর নিকট হতে কোরআনের আয়াত গ্রহণ করেছেন এবং আমরা আপনার নিকট থেকে তা গ্রহণ করেছি। আপনার উপর অবতীর্ণ আয়াতের একটি হলো ...ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوک আমি আমার উপর জুলুম (অনিষ্ট সাধন) করেছি। এখন আপনার নিকট এসেছি, আমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। [১৪৮]

হযরত বেলালের স্বপ্ন দেখা এবং সিরিয়া থেকে মদীনার উদ্দেশে রাসূলের জিয়ারতের লক্ষ্যে যাত্রার বিষয়টি যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রার বৈধতাকে ভালোভাবেই প্রমাণ করে।[১৪৯]

সাবকী বর্ণনা করেছেন, 'খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ প্রায়শই সিরিয়া হতে কাউকে না কাউকে মদীনায় তাঁর পক্ষ হতে জিয়ারত করতে ও রাসূলের প্রতি সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতেন।[১৫০]

খাতিব বাগদাদী হাম্বালী ফিকাহর শীর্ষস্থানীয় আলেম আবি আল খাল্লাল হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর সময়ে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় হযরত মূসা ইবনে জাফর (আ.)- এর কবর

জিয়ারতের নিয়ত করতেন ও সে উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন। তিনি তাঁর প্রতি তাওয়াসসুল করতেন (অর্থাৎ তাঁর মধ্যস্থতায় ও মর্যাদার শানে আল্লাহর নিকট চাইতেন)। ফলে তাঁর সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।[১৫১]

পূর্বে উল্লিখিত আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুয়াম্মালের বর্ণনা হতেও আল্লাহর ওলীদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রার বৈধতা প্রমাণিত হয়।[১৫২]

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্ও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) সাহাবীদের নিয়ে ওহুদের শহীদদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন।[১৫৩]

হযরত আয়েশা বলেছেন, ‘যে রাতগুলোতে আমার পালা থাকত এবং রাসূল (সা.) আমার ঘরে থাকতেন শেষ রাত্রিতে তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে কবর জিয়ারতে যেতে দেখতাম।[১৫৪]

উপরিউক্ত হাদীসগুলো থেকে কবর জিয়ারতের নিয়তে যাত্রা শুধু জায়েযই নয়, এমনকি মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়।

৪। মুসলমানদের ইতিহাসের ধারায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, তারা আল্লাহর ওলীদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন।

৫। আহলে সুন্নাতের সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে রাসূল (সা.) হতে অসংখ্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, যদি কেউ মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ ফেলে তার প্রতি পদে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়।[১৫৫]

এই সওয়াব লাভের বিষয়টি মসজিদে অবস্থানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও পদক্ষেপ গ্রহণের কারণেই ঘটে থাকে, তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর ওলীদের কবর জিয়ারতের প্রস্তুতি গ্রহণ ও এজন্য যাত্রাও আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়।

কবর জিয়ারত হারাম হওয়ার বিষয়গুলোতে ওয়াহাবীদের দলীল

কবর জিয়ারত হারাম হওয়ার বিষয়ে [এমনকি রাসূল (সা.)- এর কবরও] ওয়াহাবীদের প্রধান দলিল হলো আবু হুরাইরা বর্ণিত এ হাদীসটি : রাসূল (সা.) বলেছেন : 'তিনটি মসজিদ, যথা মসজিদুল হারাম, মসজিদুন নবী ও মসজিদুল আকসা ব্যতীত অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর না।'[১৫৬]

তাদের উপস্থাপিত এই দলিলের জবাবে বলব, এই হাদীসে তিনটি স্থানকে ব্যতিক্রম ধরা হয়েছে অর্থাৎ আরবী ব্যকরণের ভাষায় 'মুসতাসনা মিনহু'র অনুবর্তী। 'মুসতাসনা মিনহু' অর্থাৎ যার হতে ব্যতিক্রম করা হয়েছে তা দু'ধরনের হতে পারে।

প্রথমত মুসতাসনা মিনহু 'مسجد من المساجد' অর্থাৎ মসজিদসমূহের মধ্যে তিনটি মসজিদ ব্যতিক্রম। সেক্ষেত্রে হাদীসটির অর্থ হবে : মসজিদগুলোর মধ্যে তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্যগুলোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করা বৈধ ও জায়েয নয়।

দ্বিতীয়ত যদি 'মুসতাসনা মিনহু' স্থানসমূহ হয়, সেক্ষেত্রে স্থানসমূহের মধ্যে তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে ছাড়া যাত্রা করা জায়েয নয়।

প্রথম অর্থে মহানবী (সা.)- এর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রার ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কারণ মহানবীর কবর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

দ্বিতীয় অর্থে নিষেধাজ্ঞা সার্বিক হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে যে কোন ধরনের সফরই নিষিদ্ধ হয়ে যায়, এমনকি যদি তা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে নাও হয়। কোন ব্যক্তিই এরূপ নিষেধাজ্ঞায় বিশ্বাসী নয়।

তাই আমরা বলতে পারি, যদি হাদীসটি সহীহ ও সঠিক হয়ে থাকে তবে রাসূলের ঐ নিষেধ নিষিদ্ধ ঘোষক নয়, বরং উপদেশমূলক এ অর্থে যে, যেহেতু প্রত্যেক শহরেই মসজিদ রয়েছে তাই অন্য শহরের মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা বাঞ্ছনীয় নয় ও অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু আল্লাহর ওলীগণের

কবর জিয়ারত এরূপ নয়। উপরন্তু তাঁদের কবর জিয়ারতের বরকত ও আধ্যাত্মিক ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। আমরা পরবর্তীতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করব।

গাজ্জালী এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : 'সফর করা একটি মুস্তাহাব ইবাদত। যেমন আল্লাহর নবী, সাহাবী, তাবেয়ী, ওলীগণ ও আলেমদের কবর জিয়ারত। সার্বিকভাবে যে সকল ব্যক্তির জীবদ্দশায় তাঁদের হতে বরকত ও আধ্যাত্মিক ফায়দা লাভ করা যায় তাঁদের মৃত্যুর পরও কবর জিয়ারতের মাধ্যমে তাঁদের হতে বরকত ও ফায়দা লাভ করা যায়। তাই এ উদ্দেশ্যে যাত্রা বৈধ ও জায়েয। এ বিষয়টির সাথে মহানবী (সা.) হতে উদ্ধৃত হাদীসটির- তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করো না- কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ হাদীসটি মসজিদ সম্পর্কিত এবং সকল মসজিদ মর্যাদার দিক থেকে পরস্পর সমান। তাই একটির উপর অপরটির কোন প্রাধান্য নেই যে, তার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে তিনটি মসজিদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব রযেছে, তাই সেগুলোর উদ্দেশ্যে যাত্রার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহর ওলীদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা এ বিষয়টি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[১৫৭]

ডক্টর আবদুল মালিক সাদী বলেছেন : 'অন্য সকল মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা নিষেধ এজন্য যে, এরূপ কর্ম অর্থহীন যেহেতু সকল মসজিদের সওয়াব সমান, তিনটি মসজিদ ব্যতীত।'[১৫৮]

কবর জিয়ারত ও নারিগণ

ওয়াহাবীরা যদিও জিয়ারতের নিয়তে যাত্রা ব্যতীত কবর জিয়ারতকে পুরুষদের জন্য জায়েয মনে করে, কিন্তু নারীদের জন্য কোনভাবেই কবর জিয়ারত জায়েয মনে করে না।

দ্বীনি মাসয়ালার জবাব দানের জন্য গঠিত ওয়াহাবীদের স্থায়ী সদস্য কমিটি ঘোষণা করেছে 'কবর জিয়ারত কেবল পুরুষদের জন্য জায়েয, তদুপরি তা সে উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়ত ব্যতীত হতে হবে। কিন্তু নারীদের জন্য কোন কবর জিয়ারত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[১৫৯]

শেখ আবদুল আজিজ বিন বায বলেছেন : 'কবর জিয়ারত নারীদের জন্য জায়েয নয়। কারণ রাসূল (সা.) যে সকল নারী কবর জিয়ারতে যায় তাদের উপর অভিশাপ কামনা করেছেন।'[১৬০]

অন্যত্র এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে বলেছে, 'যেহেতু নারীদের ধৈর্যশক্তি কম, সেহেতু তারা কবরের নিকট আবেগতাড়িত হয়ে মর্সিয়া পাঠ করে ও তাদের মুখ হতে ধৈর্যের পরিপন্থী কথা বেরিয়ে আসে।'[১৬১]

এই আপত্তির জবাবে আমরা বলব : প্রথমত এই ফতোয়া রাসূলের সাহাবীদের ফতোয়া ও আচরণনীতির পরিপন্থী। কারণ হযরত ফাতিমা (আ.) রাসূলের জীবদ্দশায় প্রতি শুক্রবার (জুমআর দিনে) হযরত হামজা (রা.)- এর কবর জিয়ারতে যেতেন। তিনি তাঁর পিতা রাসূলের ইন্তেকালের পর স্বীয় পিতার কবর জিয়ারতে নিয়মিত যেতেন। প্রথম ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূল (সা.) তাঁর এ কর্মে বাধা দেন নি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হযরত আলী (আ.) ও অন্যান্য সাহাবী তাঁকে নিষেধ করেন নি। ইবনে আবি মালিকা বলেছেন, 'আমি হযরত আয়েশাকে তাঁর ভ্রাতা আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের কবর জিয়ারতে নিয়মিত যেতে দেখতাম।'[১৬২]

দ্বিতীয়ত 'হে আল্লাহ কবর জিয়ারতকারী নারীর উপর অভিশাপ বর্ষণ কর'- এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। যে তিনটি সনদে, যথা: হাসসান ইবনে সাবেত, ইবনে আব্বাস ও আবু হুরাইরা হতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তিনটি সূত্রেই দুর্বল রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) রয়েছেন।

তৃতীয়ত এ হাদীস হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত হাদীসের (রাসূল কবর জিয়ারত নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু পরে অনুমতি দিয়েছেন) পরিপন্থী।

চতুর্থত যদি নারীদের কম ধৈর্যের কারণে কবর জিয়ারত হতে তাদের নিষেধ করা হয়ে থাকে তবে যে সকল নারীর ধৈর্য অধিক ও আপত্তিজনক কথা তাদের মুখ হতে বের হয় না, তাদের ক্ষেত্রে জিয়ারত নিষিদ্ধ নয়। কারণ হারাম হওয়ার প্রাথমিক শর্ত তাদের মধ্যে নেই। হারাম তখনই হবে যখন কোন জায়েয কর্ম নিশ্চিতরূপে মানুষকে হারামে ফেলে। তাই আহলে সুন্নাতের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিই নারীদের কবর জিয়ারকে ধৈর্যধারণের শর্তে জায়েয বলেছেন।

কবর জিয়ারতের ইতিবাচক প্রভাবসমূহ

কবর জিয়ারত মানুষকে কোন অন্যায়ে তো ফেলেই না, বরং কোন কোন হাদীসে এর কল্যাণমূলক প্রভাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এখানে আমরা এরূপ কয়েকটির প্রতি ইশারা করছি :

১। জিয়ারতকারীর মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করে এবং মৃত্যু ও আখেরাতের স্মরণ করায়; সন্দেহ নেই মৃত ব্যক্তিদের কবর জিয়ারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো আখেরাতের স্মরণ।

মুসলিম, আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ইবনে মাজা এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ প্রণেতা নিজ নিজ সূত্রে রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, 'তোমরা কবর জিয়ারতে যাও, কেননা তা তোমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।'[১৬৩]

২। মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া : এ বিষয়টি একটি উন্নত নৈতিক পদ্ধতি যা মৃত্যুর পরও সমাজে একজন মুসলমানের মর্যাদাকে রক্ষা ও সমুন্নত রাখার প্রমাণ বহন করে। উপরন্তু সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও অধিকার রক্ষার মনোবৃত্তিকে জাগরুক রাখে।

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমাদেরকে আমি কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন হতে তোমরা কবর জিয়ারত কর এবং তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা কর।'[১৬৪]

৩। মৃতের অধিকার রক্ষা : নিঃসন্দেহে কোন কোন মৃত ব্যক্তি জীবিতদের উপর বিশেষ অধিকার রাখেন। এই অধিকারের দাবী হলো জীবিতরা তাঁদের কবর জিয়ারত করবে। ইমাম রেজা (আ.) বলেছেন, 'প্রতি ইমামের তাঁদের অনুসারীদের উপর অধিকার ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা পালনের সর্বোত্তম পন্থা হলো তাঁদের কবর জিয়ারত।'[১৬৫]

আল্লাহর ওলীদের কবর জিয়ারতের দর্শন

আল্লাহর ওলীদের বিশেষত মহানবী (সা.) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের ইমামদের কবর জিয়ারতের বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রভাব ও বরকত রয়েছে। এখানে আমরা আল্লাহর ওলীদের কবর জিয়ারতের কিছু আত্মিক প্রভাবের উল্লেখ করছি:

১। আল্লাহর ওলী ও ধর্মীয় ব্যক্তিগণ প্রকৃতপক্ষে সকলের আদর্শ যাদের অনুসরণের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভ ও পূর্ণতায় পৌঁছা যায়। শুধু মুসলিম সমাজেই নয়, বরং যে কোন সমাজেই তাঁদের অনুসরণীয় ব্যক্তিদের মহৎ হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস চালায় যাতে করে অন্যরাও তাঁদের অনুসরণের মাধ্যমে পূর্ণতা ও সাফল্যের পথে পা রাখতে পারে। যদিও এই অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ জীবিত নেই কিন্তু তাঁদের কবর ও স্মৃতি সৌধে গমনের আহ্বান তাঁদের পথে চলতে অন্যদের অনুপ্রাণিত করে।

অনেক দেশেই কোন বিশেষ চত্বর বা ভাস্কর্যকে নাম না জানা আত্মত্যাগী সৈনিকদের নামে নামকরণ করা হয়। কারণ তারা দেশ প্রেমের প্রতীক এবং এ পথে নিজ জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছে। এ কর্মের মাধ্যমে ঐ জাতি চায় নতুন প্রজন্মকে তাদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বহিঃশত্রুর হাত হতে দেশ রক্ষার মহান ব্রত নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

জাতির মহান ব্যক্তিবর্গ ও আদর্শ নেতাদের কবরের নিকট যাওয়ার বিশেষ আত্মিক প্রভাব রয়েছে মনস্তত্ত্ববিদগণ এ বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন।

আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ বলেছেন : সময়ের পরিক্রমায় এমন দিন আসল যখন হুসাইন (আ.)-এর জন্য সকল পথ রুদ্ধ করে কারবালার দিকে যেতে তাঁকে বাধ্য করা হল। আজ পর্যন্ত কারবালার ইতিহাস ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তা মানবজাতির ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়েছে।

কারবালা বর্তমানে এমন এক স্থানে পরিণত হয়েছে, যেখানে মুসলমানগণ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে জিয়ারতে যায়। এমনকি অমুসলমানরাও সেখানে ভ্রমণ ও দর্শনের উদ্দেশ্যে যায়। কিন্তু কারবালার অধিকার তখনই আদায় হবে যখন তা মানুষের জন্য পবিত্রতা ও মর্যাদায় বিশ্বাসী

প্রতিটি ব্যক্তির জিয়ারতের স্থানে পরিণত হবে। কারণ আমার এমন কোন স্থানের কথা জানা নেই যা কারবালার ন্যায় মানবতার সকল মর্যাদাপূর্ণ ও ইতিবাচক সুন্দর দিকের স্মৃতি বহন করছে এবং এ বৈশিষ্ট্য সেটি ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের মাধ্যমে অর্জন করেছে।[১৬৬]

২। জিয়ারত ভালবাসার প্রকাশ ও প্রতিচ্ছবি সন্দেহ নেই। আহলে বাইতের ভালবাসা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের উপর ওয়াজিব। মহানবী (সা.) বলেছেন : أحِبُّوا اهل بيتى لِحُبّى 'আমার আহলে বাইতকে আমার ভালবাসার কারণে ভালবাস।'[১৬৭]

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর ভালবাসা যেমনি ওয়াজিব তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসাও তদ্রুপ ওয়াজিব। আমরা জানি ভালবাসার অবশ্যই প্রকাশ আছে যা শুধু তাঁদের আনুগত্য ও আন্তরিক ভালোবাসা পোষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁদের কবর জিয়ারতও ঐ আন্তরিক ভালোবাসার প্রকাশ।

৩। মহানবী (সা.) আহলে বাইতের পবিত্র ব্যক্তিদের কবর জিয়ারত তাঁর রেসালতের দায়িত্বে একরূপ বিনিময় স্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾

"(হে নবী!) বলুন, আমি আমার রেসালতের দায়িত্বের বিনিময় স্বরূপ আমার নিকটাত্মীয়ের ভালবাসা ব্যতীত কিছুই চাই না।" [১৬৮]

রাসূলের নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা পোষণের অন্যতম প্রকাশ হলো তাঁদের কবর জিয়ারত।

৪। আল্লাহর ওলীদের কবর জিয়ারত তাঁদের অনুসৃত পথের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতার নিদর্শন।

৫। আল্লাহর ওলিগণের কবর জিয়ারত বাস্তবিক ভাবে তাঁদের সঙ্গে নতুন করে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হওয়া যে, তাঁদের আদর্শ ও পথকে আমরা চিরজাগরুক রাখব। আমরা জানি আহলে বাইতের ইমামগণ আমাদের উপর অধিকার ও অভিভাবকত্ব রাখেন। তাই আমাদেরও উচিত তাঁদের অভিভাবকত্ব ও আমাদের উপর অধিকারকে মেনে নিয়ে তাদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। এই

প্রতিশ্রুতি শুধু মুখে ঘোষণার মাধ্যমে নয়, বরং নিজেদের কর্মের মাধ্যমে এই আন্তরিক প্রতিশ্রুতির প্রকাশ ঘটাব। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁদের কবর জিয়ারত ও তাঁদের রওজায় উপস্থিতির মাধ্যমে এই প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি ঘটাব। এ কারণেই ইমাম রেজা (আ.)- এর হাদীসে এসেছে- নিশ্চয়ই প্রতি ইমামের তাঁদের অনুসারীদের উপর অধিকার ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা রক্ষা ও পালনের সর্বোত্তম পন্থা হলো তাঁদের কবর জিয়ারত করা।'[১৬৯]

৬। আল্লাহর ওলীদের কবর জিয়ারত মানুষের আধ্যাত্মিকতাকে বৃদ্ধি করে ও হৃদয়ে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে।

৭। আল্লাহর ওলীদের কবর জিয়ারত তাঁদের সন্তুষ্টির কারণ হয় এবং তাঁদের দোয়ার ফলে ঐশী বরকত জিয়ারতকারীর উপর অবতীর্ণ হয়।

৮। ওলিগণের কবরের নিকটে গেলে তাঁদের ঐতিহাসিক অবদান ও আত্মত্যাগের কথা সকলের স্মরণ হয় যা তাঁদের অনুসৃত পথে চলার দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে তাদের উদ্বুদ্ধ করে।

৯। সর্বোপরি তাঁদের কবর জিয়ারত তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সন্ধির এবং তাঁদের শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা স্বরূপ।

ইমাম হুসাইন (আ.)- এর কবর জিয়ারতের ফজিলত

আহলে বাইতের ইমামগণের হাদীসসমূহে ইমাম হুসাইনের কবর জিয়ারতের বিষয়ে বিশেষ তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেমন :

১। ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : 'আমাদের অনুসারীদের অবশ্যই ইমাম হুসাইনের কবর জিয়ারত করতে বল। কারণ ইমাম হুসাইনের ইমামতে বিশ্বাসী যে কোন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাঁর কবর জিয়ারত ওয়াজিব করেছেন।'[১৭০]

২। ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : 'আমাদের অনুসারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইমাম হুসাইনের কবর জিয়ারত করবে ফিরে আসার পূর্বেই তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।'[১৭১]

৩। ইমাম রেজা (আ.) তাঁর পিতা মূসা কাজিমের সূত্রে ইমাম সাদিক (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন : 'ইমাম হুসাইনের জিয়ারতকারীর জিয়ারতের সময় তার জীবনকাল হিসেবে পরিগণিত হবে না।'[১৭২]

৪। ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি মহানবী (সা.), হযরত আলী (আ.) ও হযরত ফাতিমা জাহ্‌রার (আ.) প্রতিবেশী হিসেবে বেহেশতে থাকতে চায়, সে ইমাম হুসাইনের জিয়ারত ত্যাগ করতে পারে না।'[১৭৩]

৫। ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : 'যে কেউ ইমাম হুসাইনের জিয়ারতে যাবে এমতাবস্থায় সে ইমাম হুসাইনের সত্যিকার অবস্থান ও মর্যাদাকে অনুধাবন করেছে তবে তার সকল গুনাহ (পূর্বের ও পরের) ক্ষমা করে দেয়া হবে।'[১৭৪]

৬। আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি নাসর বলেছেন : 'আমাদের কিছু নির্ভরযোগ্য রাবী ইমাম রেজাকে (আ.) ইমাম হুসাইনের কবর জিয়ারতের সওয়াব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জবাবে বলেন, 'এর সওয়াব এক উমরাহ্‌র সমান।[১৭৫]

৭। মুহাম্মদ ইবনে সিনান বলেছেন : 'আমি ইমাম রেজাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, 'যে কেউ ইমাম হুসাইনের কবর জিয়ারত করবে আল্লাহ তার আমলনামায় মকবুল হজ্বের সওয়াব লিখে দিবেন।'[১৭৬]

৮। ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : ‘ইমাম হুসাইনের কবর জিয়ারতের সওয়াব বিশটি হজ্জের সমান অথবা তার হতেও উত্তম।’[১৭৭]

কেন ইমাম হুসাইন (আ.)- এর কবর জিয়ারত কাবা ঘরের জিয়ারত হতে উত্তম?

কোন কোন ওয়াহাবী আলেম উপরিউক্ত হাদীসসমূহ দেখে ইমামীয়া শীয়াদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছে এবং তাদের উপর প্রচণ্ড হামলা করেছে। তারা দাবী করেছেন যে, এ ধরনের হাদীসসমূহ মুসলমানদের হজ্জ্ব করা হতে বিরত রাখে এবং হজ্জ্বের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে দুর্বল করে। শুধু তাই নয় (নাউজুবিল্লাহ্) ইমাম হুসাইনকে আল্লাহর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাই এরূপ চিন্তা বিশ্বাসের প্রচারকে প্রতিহত করতে হবে। কারণ তা একরূপ অতিরঞ্জন। এই আপত্তির জবাবে আমরা কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করছি :

১। সম্ভাবনা রয়েছে এই হাদীসসমূহ বিশেষ দৃষ্টিকোণ হতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ যখনই ইসলাম হুমকির সম্মুখীন এবং মুসলমানরা নামায, রোজা, হজ্জ্ব প্রভৃতির মত ইবাদতগুলোর বাহ্যিকতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য করবে কিন্তু ইবাদত তার প্রকৃত মর্ম ও অর্থ হারিয়ে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বে তখন অবশ্যই শাহাদাতের রক্তিম পথে অগ্রসর হতে হবে। কারণ প্রথমে ইসলামী সমাজ ও শরীয়তের দেহে প্রকৃত প্রাণের সঞ্চার করতে হবে তারপর শরীয়তের বাহ্যিকতার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। (৬০ হিজরীর জিলহজ্জ্ব মাসের ৮ তারিখে ইমাম হুসাইন (আ.) হজ্জ্বের জন্য আরাফার দিকে যাত্রা না করে কুফার দিকে যাত্রা করেন। তাঁর এ কর্মের উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে বলা যে, ইসলামের প্রাণের অস্তিত্ব না থাকলে, তা শুধুই সামাজিক আচারে পরিণত হলে ও সমাজে তার শিরক, কুফর, ও বিদআত প্রতিরোধকারী ভূমিকা না থাকলে জিহাদ ও শাহাদাতের পথ বেছে নিতে হবে- সেক্ষেত্রে নিছক আচারভিত্তিক ইবাদত মূল্যহীন। যদি কোন মুসলিম দেশে ইসলামের শুধু নাম থাকে, কিন্তু তার শরীয়তের কোন প্রাণ না থাকে তখন উচিত হবে ইমাম হুসাইনের পথ অবলম্বন করে জাতিকে প্রকৃত ইসলামের সাথে পরিচিত করানো। অতঃপর শরীয়তের বাহ্যিকতার প্রতি দৃষ্টি দেয়া, যেমনটি ইমাম হুসাইন করেছেন। যখন সবাই হজ্জ্ব করার জন্য মক্কায় আসছিল তখন তিনি হজ্জ্বের অনুষ্ঠান অসমাপ্ত রেখে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ

‘সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে’ রত হন। মুসলিম উম্মতকে জাগরিত করতে ও শরীয়তকে পুনর্জীবন দানের লক্ষ্যে স্বীয় জীবন বিলিয়ে দেন।

২। কাবার সম্মান এ কারণেই যে, তা আল্লাহর নির্দেশে তাঁর প্রেরিত এক রাসূলের মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে। কোন কোন হাদীসের বর্ণনামতে কাবা আল্লাহর প্রতিপালক ও মাবুদ হওয়ার বৈশিষ্ট্যের প্রতিপালক, কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা.) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের ইমামগণ আল্লাহর সকল গুণের প্রতিচ্ছায়া ও প্রকাশ। এ কারণেই আমরা জিয়ারতে জামেয়ে কাবিরাতে পড়ে থাকি

من أراد الله بدأ بكم و من وحّدهُ قبل عنكم و من قصده توجّهُ

অর্থাৎ যারা আল্লাহকে চায়, তারা আপনাদের থেকে শুরু করে, যে কেউ আল্লাহকে এক জানে, সে আপনাদের থেকে গ্রহণ করে, যে কেউ আল্লাহর প্রতি যাত্রা করে, আপনাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়। দোয়া নুদবাতেও আমরা পড়ি

أين وجهُ الله الّذى إليه يتوجّهُ الاولياء

কোথায় আল্লাহ বিরাজমান যার প্রতি তাঁর ওলীরা মুখ ফেরায়।

৩। প্রতি মুসলমানের জন্য ওয়াজিব হলো শরীয়তের বিধি- বিধান শিক্ষা করা, তারপর তা পালন করা, যেমন হজ্জ্ব ও হজ্জ্ব সম্পর্কিত মাসলা- মাসায়েল শিক্ষা করা অপরিহার্য। অতঃপর হজ্জ্বে গমনের পর তা আদায় করতে হবে। যেহেতু ইমামগণ মহানবী (সা.)- এর শরীয়তের ব্যাখ্যা দানকারী সেহেতু প্রথমে তাঁদের শরণাপন্ন হয়ে তাঁদের ঐশী ও শরীয়তগত বেলায়েতকে (অভিভাবকত্ব) মেনে নিয়ে তাঁদের নির্দেশানুযায়ী হজ্জ্ব পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে ইমামদের বেলায়েত শরীয়তের বিধান, যেমন হজ্জ্বের উপর প্রাধান্য রাখে।

৪। সম্ভবত ইমামের মর্যাদা ও সঠিক পরিচয়সহ জিয়ারত করলে তবেই তা মুস্তাহাব হজ্জ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখবে এবং এ হাদীসের উদ্দেশ্য ওয়াজিব হজ্জ্ব নয়। কারণ জিয়ারতের মতো

মুস্তাহাব কর্ম কখনোই হজ্জের মতো ওয়াজিব কর্মের উপর প্রাধান্য রাখতে পারে না। কিন্তু মুস্তাহাব জিয়ারত ও মুস্তাহাব হজ্জের মধ্যে মুস্তাহাব জিয়ারতের প্রাধান্য রয়েছে।

কবরের উপর সৌধ নির্মাণ

মুসলমানদের সাথে ওয়াহাবীদের বিরোধের অন্যতম বিষয় হলো কবরের উপর গম্বুজ ও সৌধ নির্মাণ সম্পর্কিত। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মুসলমানগণ এই রীতিটি অনুসরণ করে এসেছে এবং এ বিষয়টি জায়েয ও মুস্তাহাব হওয়ার সপক্ষে কোরআন ও হাদীস হতে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। উপরন্তু এ কর্মটি যৌক্তিক এবং তা বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুসৃত রীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু ইবনে তাইমিয়ার সময় হতে এই রীতির বিরোধিতা শুরু হয়। তিনি কবরের উপর সৌধ ও গম্বুজ তৈরিকে শিরক বলে ঘোষণা করেন। হিজাযে আলে সউদের আধিপত্যের সময় এই বিশ্বাস তুঙ্গে পৌঁছায় ও সউদী শাসকগণ এই ফতোয়ার ব্যবহারিক বাস্তবায়নে রত হয়। ওয়াহাবী আলেমদের ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তারা সকল মাজার, কবরের উপরে নির্মিত সৌধ ও গম্বুজ ধ্বংসকার্যে রত হয়। মহানবীর কবর ব্যতীত সকল সৌধ তারা ধ্বংস করে। তাঁর পবিত্র রওজা ধ্বংসের ইচ্ছা থাকলেও মুসলমানদের প্রতিরোধের ভয়ে তারা তা করতে পারে নি। তারা তাদের এ ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে এ প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করব।

ওয়াহাবীদের ফতোয়া

১। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : ‘আল্লাহর নবিগণ তাঁদের আহলে বাইতের সদস্য ও অন্যান্য সৎকর্মশীল বান্দাদের কবরের উপর যে সকল সৌধ নির্মিত হয়েছে তা হারাম ও বিদআত। যা অন্য স্থান হতে ইসলামে প্রবেশ করেছে।[১৭৮]

২। তিনি অন্যত্র বলেছেন : ‘শিয়ারা কবরসমূহের উপর যে সৌধ নির্মাণ করে তার সামনে সম্মান প্রদর্শনের জন্য নত হয়ে থাকে তা মুশরিকদের মূর্তিপূজার ন্যায়। তারা কাবা ঘরের হজ্জের ন্যায় ঐ সকল কবর ও সৌধের উদ্দেশ্যে হজ্জ্ব করে থাকে।[১৭৯]

৩। সেনআনী বলেছেন : ‘ওলীদের কবরের উপর নির্মিত সৌধ মূর্তির ন্যায় এবং তারা জাহেলী যুগের মুশরিকদের ন্যায় ওলীদের কবরের সামনে বিভিন্ন আচার পালন করে।’[১৮০]

৪। ওয়াহাবীদের ফতোয়া প্রদানের স্থায়ী পরিষদ এক প্রশ্নের জবাবে বলেছে, ‘কবরের উপর সৌধ নির্মাণ নিষিদ্ধ বিদআত যা কবরবাসীর প্রতি অতিমানবীয় বিশ্বাস ও তার প্রতি অতিরঞ্জিত সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে হয়ে থাকে এবং তা মানুষকে শিরকের দিকে পরিচালিত করে। তাই মুসলমানদের (দায়িত্বশীল) নেতা অথবা তার প্রতিনিধির কবরের উপর নির্মিত এরূপ সৌধসমূহ ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার নির্দেশ দান করা উচিত। এর মাধ্যমে কর্মগত বিদআতের মূলোৎপাটন করে শিরকের পথ চিরতরে রুদ্ধ করতে হবে।’[১৮১]

৫। নাসিরুদ্দীন আলবানী সউদ বংশের শাসকদের প্রস্তাব করেছে মহানবীর পবিত্র রওজার সবুজ গম্বুজটি ভেঙ্গে ফেলার। সে বলেছে, ‘এটি আফসোসের বিষয় যে, দীর্ঘদিন হল রাসূলের কবরের উপর একটি গম্বুজ প্রস্তুত হয়েছে... আমার বিশ্বাস সউদী সরকারের একত্ববাদের দাবী যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তাদের উচিত তা চূর্ণ করে মসজিদে নববীকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা।’[১৮২]

কবরের উপর সৌধ নির্মাণ ও পবিত্র কোরআন

পবিত্র কোরআন কবরের উপর সৌধ নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে সুস্পষ্ট কিছু না বললেও কোরআনের আয়াত হতে এ সম্পর্কিত বিধান পাওয়া যায়। এ যুক্তিতে যে-

১। কবরের উপর সৌধ নির্মাণ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শামিল। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে তাঁর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ তা অন্তরের পরহেজগারীর (আত্মসংযম) প্রমাণ। যেমন বলা হয়েছে,

﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾

"যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান করে তা অন্তরের পরহেজগারীর (দ্বীনের) প্রমাণস্বরূপ।"[১৮৩]

'شعائر' শব্দটি 'شعيره' শব্দের বহুবচন যার অর্থ নিদর্শন ও প্রমাণ। 'আল্লাহর নিদর্শন'(شعائر الله) হলো এমন কোন প্রতীক যা আল্লাহর দিক নির্দেশক। যদি কেউ আল্লাহর নিকট পৌঁছাতে চায় তবে ঐ প্রতীকের মাধ্যমে তাতে পৌঁছাতে পারে। অবশ্য (নৈকট্য পেতে চায়)'আল্লাহর নিদর্শন' অর্থ যদি তাঁর দ্বীনের নিদর্শন বুঝায় তবে আয়াতটির অর্থ হবে যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় তবে তাঁর দ্বীনের নিদর্শনসমূহের স্থান প্রদর্শনের মাধ্যমে তা অর্জন করতে হবে।

পবিত্র কোরআনে সাফা ও মারওয়াকে আল্লাহর নিদর্শন ও চিহ্ন বলা হয়েছে:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া (পর্বত দু ' টি) আল্লাহর (দ্বীনের) নির্দশন।" [১৮৪]

কোরবানীর উদ্দেশ্যে যে উটকে মিনায় নিয়ে যাওয়া হয় তাকেও আল্লাহর নিদর্শন বলা হয়েছে,

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ﴾

"আমরা কোরবানীর হৃষ্টপুষ্ট উষ্ট্রকে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন বানিয়েছি। (দ্বীনের)" [১৮৫]

এ বিষয়গুলো ইবরাহীমের ধর্মের (দ্বীনে হানিফের) নিদর্শনসমূহরে অন্তর্ভুক্ত। মুজদালিফাকে مَشعَر বলা হয়, কারণ তা আল্লাহর দ্বীনের নিদর্শন ও প্রতীক স্বরূপ। হজ্জের সকল আচারই আল্লাহর দ্বীনের নিদর্শন কারণ তা একত্ববাদী ও অবিকৃত ধর্মের প্রতীকস্বরূপ।

যেহেতু এই আচারসমূহ আল্লাহর দ্বীনের নিদর্শনস্বরূপ এবং মানবজাতিকে একত্ববাদী ও অবিকৃত ঐশী দ্বীনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সেহেতু নিঃসন্দেহে বলা যায়, আল্লাহর নবী ও ওলিগণ তাঁর দ্বীনের সর্বোচ্চ নিদর্শন। কারণ তারা হলেন নিষ্পাপ, কখনোই অন্যায়কর্ম করেন না এবং তাদের বাণী ও কর্ম সত্যের অনুরণন। তাঁরা এমন এক আদর্শ যাদের অনুসরণে একত্ববাদ ও মহাসত্যের পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

যখন মহানবী (সা.), তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি (পবিত্র ইমামগণ) ও আল্লাহর অন্যান্য ওলিগণ এরূপ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তখন তাদের সকল স্মৃতি সংরক্ষন যেমন তাঁদের কবর, তা সংরক্ষনের নিমিত্তে তার উপর সৌধ ও গুম্বুজ নির্মাণ আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মানেরই নমুনা স্বরূপ। কারণ এরূপ কর্ম সেই ব্যক্তিবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে করা হয়, যাদের কর্ম, বাণী ও নির্দেশনা মানুষকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে।

কুরতুবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'আল্লাহর নিদর্শন হলো এমন কিছু যা তাঁর দ্বীনের চিহ্ন ও স্মৃতি বহন করে বিশেষত যে সকল বিষয় দ্বীনের আচারের পথে সংশ্লিষ্ট।[১৮৬]

মিশরীয় লেখক প্রফেসর আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ কারবালা ও ইমাম হুসাইনের মাজার সম্পর্কে বলেছেন : 'কারাবালা এমন একস্থান যেখানে মুসলমানরা শিক্ষাগ্রহণ ও ইমাম হুসাইনের স্মরণের জন্য যায়। অমুসলমানরাও সেখানে দর্শনের জন্য যায়। কিন্তু যদি ঐ ভূমির প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে অবশ্যই তা সেই সব ব্যক্তিদের জিয়ারতের স্থান হওয়া উচিত যারা স্বজাতির জন্য বিশেষ পবিত্রতা ও মর্যাদায় বিশ্বাসী। কারণ জিয়ারতের স্থানগুলোর মধ্যে ইমাম হুসাইনের মাজার হতে উত্তম কোন স্থানের কথা আমার জানা নেই।'

২। মহানবীর পবিত্র আহলে বাইতের সদস্যদের কবরসমূহের উপর সৌধ নির্মাণ মহানবীর নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ স্বরূপ।

পবিত্র কোরআন সুস্পষ্টরূপে আল্লাহর নবীর রক্তসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা পোষণের নির্দেশ দিয়েছে-

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ﴾

“তোমাদের হতে আমি আমার কোন বিনিময় চাই না কেবল আমার (রিসালাতের দায়িত্বের) অতিনিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া।[১৮৭]

নিঃসন্দেহে মহানবীর অতিনিকটাত্মীয়দের কবর সংরক্ষণের নিমিত্তে তার উপর সৌধ নির্মাণ করে জিয়ারতকারীদের জন্য তা চিহ্ন হিসেবে উপস্থাপন তাঁদের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ স্বরূপ। কারণ প্রতিটি ভালোবাসারই প্রকাশ আছে এবং শুধু তাঁদের আনুগত্য করা ও তাঁদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করাই ভালোবাসার নিদর্শন নয়, বরং সৌধ নির্মাণের মাধ্যমে তাঁদের কবর সংরক্ষণও তাঁদের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন, যেহেতু এরূপ কর্ম কোন সূত্রেই নিষিদ্ধ করা হয় নি। (আবুশ শুহাদা, পৃ. ৫৬)

৩। আল্লাহর ওলীদের কবরের উপর সৌধ নির্মাণ পবিত্র গৃহসমূহকে সমুন্নত রাখার নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত, মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে অনুমতি দিয়েছেন যেসকল গৃহে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তা সমুন্নত করার।

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

“আল্লাহ যেসব গৃহকে (যাতে তাঁর নূর রয়েছে) মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন লোকেরা যাদের ব্যবসা- বাণিজ্য ও ক্রয়- বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা থেকে এবং জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না।” (সূরা নূর : ৩৬- ৩৭)

উপরিউক্ত আয়াত হতে আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে দু’টি প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়।

প্রথমত উপরিউক্ত আয়াতে গৃহ বলতে শুধু মসজিদ বুঝানো হয়নি, বরং আয়াতের উদ্দেশ্য মসজিদসহ যে কোন স্থান যেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, যেমন নবিগণ ও তাঁদের

স্থলাভিষিক্ত পবিত্র প্রতিনিধিদের গৃহ। এমনকি এ দাবীও সত্য যে, উপরিউক্ত আয়াতটিতে মসজিদ ভিন্ন অন্য গৃহের বা গৃহসমূহের কথা বলা হয়েছে। কারণ গৃহ বলতে যে কোন চার দেয়াল ও ছাদ বিশিষ্ট স্থানকে বুঝানো হয়। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾

"যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী (কাফের) হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত তবে যারা দয়াময়কে (আল্লাহকে) অস্বীকার করে তাদের গৃহসমূহের ছাদ ও সিঁড়িকে যা দ্বারা তারা উপরে যেত আমি রৌপ্য নির্মিত করে দিতাম।" [১৮৮]

উপরিউক্ত আয়াত হতে বোঝা যায় আরবী ভাষায় যে, কোন ছাদ বিশিষ্ট কক্ষকেই গৃহ ((بيت)) বলা হয়। তদুপরি হাদীসসমূহে বলা হয়েছে মসজিদ ছাদবিহীন হওয়া মুস্তাহাব। তাই উল্লিখিত আয়াতে গৃহ বলতে মসজিদ ভিন্ন অন্য গৃহের কথা বলা হয়েছে। উপরন্তু রাসূলের আহলে বাইতের সূত্রে ইমাম বাকির (আ.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরিউক্ত আয়াতে গৃহ বলতে নবিগণ ও হযরত আলীর গৃহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। [১৮৯]

পবিত্র কাবাগৃহকে বাইতুল্লাহ্ বলা হয়, কারণ তার ছাদ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত আয়াতে যে সমুন্নত করার কথা বলা হয়েছে তার দু'রকম অর্থ হতে পারে :

ক) গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা দান যেমনটি আমরা এ আয়াতটিতে পড়ি

﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾

"আমরা তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছি।" [১৯০]

খ) আয়াতের লক্ষ্য বাহ্যিক ও বস্তুগত উন্নয়ন অর্থাৎ ঐরূপ গৃহ বা স্থানের যেমন ওলীদের কবরের উপর সৌধ নির্মাণের মাধ্যমে গৃহ বা কবরকে উন্নীত করা।

জামাখশারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেছেন : গৃহকে উন্নীত করার অর্থ গৃহের কাঠামোকে উচ্চ করা যেমনটি নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে-

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾

“(স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তিকে উন্নীত করেছিল।” অথবা কাবাগৃহের প্রতি মর্যাদা দেখানোও সম্মান প্রদর্শন।" [১৯১]

তাফসীরে রুহুল বায়ানে বলা হয়েছে (أن ترفع) উন্নীত করার অর্থ উচ্চ করা অথবা সেগুলোর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করা।[১৯২]

যদি আয়াতটিতে উন্নীত করার অর্থ বাহ্যিক ও কাঠামোগত উন্নয়নের কথা বলা হয়ে থাকে তবে তা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর নবী ও ওলীদের কবরকে উন্নীত করণের দলিল হবে। বিশেষত যখন মহানবী (সা.) সহ তাঁর আহলে বাইতের কয়েকজন ইমাম তাঁদের গৃহেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। আর যদি উন্নীত করণের অর্থ মর্যাদা দান ও অবস্তুগত উন্নয়ন হয়ে থাকে তবে তার অর্থ হবে নবী ও আল্লাহর ওলীদের গৃহ ও কবরসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে তা সংরক্ষন করা, সৌধ নির্মাণ ও তার মেরামত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী আনাস ইবনে মালিক ও কুরাইদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) فی بیوت اذن أن ترفع আয়াতটি পাঠ করলে একব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল : ‘এখানে কোন গৃহসমূহের কথা বলা হয়েছে?’

রাসূল (সা.) বললেন : ‘নবিগণের গৃহসমূহ’। হযরত আবু বকর রাসূলকে তখন হযরত আলী ও ফাতিমার গৃহের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল! এই গৃহটিও কি ঐসব গৃহের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ ও আপনার দৃষ্টিতে যার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা উচিত।’তিনি বললেন : ‘এই গৃহটি ঐ গৃহসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।’[১৯৩]

প্রাথমিক যুগের অনুসরণীয় মুসলমানদের কর্ম ধারায় কবরের উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ

ইসলামের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখি, ইসলামের আবির্ভাবের যুগ থেকেই মুসলমানদের মধ্যে কবরের উপর সৌধ নির্মাণের প্রচলন ছিল এবং এ বিষয়টি কখনোই সাহাবী ও তাবেয়ীদের প্রতিবাদের মুখোমুখি হয় নি। ইতিহাসের পরিক্রমায় প্রথমবারের মত ওয়াহাবীরা এ রীতির বিরুদ্ধে মৌখিক ও ব্যবহারিকভাবে প্রতিবাদ শুরু করে। মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত এ রীতির কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ করছি :

১। মুসলমানগণ রাসূলের পবিত্র দেহ মোবারককে ছাদ বিশিষ্ট গৃহে দাফন করেন। তখন থেকেই তা সাহাবাদের সম্মানের স্থান হিসেবে পরিগণিত হতো।

হুসাইন ইবনে আহমান ইবনে মুহাম্মদ যিনি আবিল খাজ্জাজ বাগদাদী নামে প্রসিদ্ধ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর একজন কবি যিনি হযরত আলীর প্রশংসায় রচিত উচ্চমানের কাসীদা যা তিনি তাঁর পবিত্র রওজার সন্নিকটে রচনা করেছেন তাতে আমিরুল মুমিনিনের কবরের উপর নির্মিত সাদা গুম্বুজের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন :

يا صاحب القبة البيضاء على النجف

من زار قبرك واستشفى لديك شفى

زوروا ابا الحسن الهادى لعلكم

تحظون بالاجر و الاقبال و الزلف

‘হে নাজাফের সাদা গম্বুজের অধিকারী,

যে আপনাকে জিয়ারত করে শাফা (আরোগ্য) চায় সে শাফা লাভ করে,

তোমরা হেদায়েতকারী আবুল হাসানের (আলীর) কবর জিয়ারত কর,

যাতে পুরস্কার, সৌভাগ্য ও নৈকট্যের অধিকারী হতে পার।’[১৯৪]

৩। বুখারী তাঁর সহীহেত বর্ণনা করেছেন যে, হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী (আঃ) মৃত্যুবরণ করলে তাঁর স্ত্রী তাঁর কবরের উপর ছাউনী দিয়ে তাঁর নিকট বসে একবছর নিয়মিত ক্রন্দন করেছিল।[১৯৫]

মোল্লা আলী কারী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন: 'বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় কবরের উপর ছাউনী এ উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছিল যে, যাতে করে তার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তার কবরের নিকট এসে কোরআন তেলাওয়াত, জিকির করতে পারে এবং তার সঙ্গীরা তার জন্য দোয়া ও মাগফেরাত কামনার জন্য সেখানে যায়।'

৪। সাইয়্যেদ বাকরী বলেছেন : 'কবরের উপর সৌধ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা হতে নবিগণ, শহীদ ও সৎকর্মশীল বান্দারা বহির্ভূত।'[১৯৬]

৫। ইবনে শাবাহ বর্ণনা করেছেন, 'আকীল ইবনে আবি তালিব তার নিজগৃহে কূপ খনন করার সময় একটি পাথরের সন্ধান পান যাতে লেখা ছিল : এই কবরটি সাখর ইবনে হারবের কন্যা হাবীবার। আকীল তখন কবরটি ঢেকে দিয়ে তার উপর একটি গৃহ নির্মাণ করলেন।'[১৯৭]

৬। সামহুদী হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কবরের বর্ণনা দিয়ে বলেন : 'তার কবরের উপর সুন্দর, মজবুত ও উঁচু একটি গম্বুজ রয়েছে. আব্বাসীয় খলিফা নাসিরুদ্দীনের (৫৭৫- ৬২২) শাসনামলে তা নির্মিত হয়েছে। [১৯৮]

৭। ইবনে সা'দ তার তাবাকাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, 'উসমান ইবনে মাজউনের মৃত্যুর পর জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফনের পর রাসূল (সা.) তার কবরের উপর স্থায়ী কিছু স্থাপন করলেন এবং বললেন : 'এটি তার কবরের চিহ্ন।'[১৯৯]

আমর ইবনে হাজম বলেছেন : 'উসমান ইবনে মাজউনের কবরের নিকট উঁচু কিছু স্থাপিত দেখলাম যা প্রতীকের মত ছিল।'[২০০]

মুতাল্লাব বর্ণনা করেছেন, 'উসমান ইবনে মাজউনের মৃত্যু ও দাফনের পর মহানবী (সা.) নির্দেশ দিলেন পাথর জাতীয় কিছু আনার। একব্যক্তি ভারী একটি পাথর আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ

হলে মহানবী (সা.) আস্তিন গুটিয়ে পাথরটি উঠালেন ও উসমান ইবনে মাজউনের কবরের নিকট স্থাপন করলেন এবং বললেন : ‘তার কবরের চিহ্ন রাখতে চাই।’[২০১]

৮। ইবনে সা’দ ইমাম বাকির (আ.) হতে বর্ণনা করেছে, ‘রাসূলের কন্যা ফাতিমা হযরত হামজার কবরের নিকট যেতেন ও তা পরিপাটি ও সংস্কার করতেন।’[২০২]

৯। বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, আবদুর রহমান ইবনে আবি বাকরের মৃত্যুর পর হযরত আয়েশা নির্দেশ দিয়েছিলেন তার কবরের উপর তাঁবু স্থাপনের এবং একজনের উপর তা দেখাশোনার দায়িত্ব আরোপ করেন।[২০৩]

১০। হযরত উমর রাসূলের স্ত্রী জয়নাব বিনতে জাহাশের কবরের উপর তাঁবু নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং কেউ তার এ কাজে বাধা দেয় নি।[২০৪]

ওয়াহাবীদের দলিল সমূহের পর্যালোচনা

ওয়াহাবিগণ কবরের উপর সৌধ নির্মাণ হারাম হওয়ার সপক্ষে যে দলিল উপস্থাপন করেছে আমরা এখানে তার উত্তর দান করব।

১। কবরের উপর সৌধ নির্মাণ শিরকের অন্যতম দৃষ্টান্ত অথবা শিরকের দিকে মানুষকে ধাবিত করে।

আমরা তাদের এ কথার জবাবে বলব : প্রথমত আমরা অন্যত্র তাওহীদ ও শিরকের আলোচনায় উল্লেখ করেছি শিরকের দু'টি দিক রয়েছে- মানুষ এমন কোন কাজ করবে যা কারো প্রতি অবনত হওয়ার পরিচায়ক এবং যার প্রতি অবনত হয় তার উপাস্য ও প্রতিপালক হওয়ার বিশ্বাস রাখে। শিরকের এই দু'টি স্তম্ভ ও দিক শিরক সম্পর্কিত আয়াত ও তার সংজ্ঞা হতে জানা যায়। এই দু'টি দিকের উপস্থিতি কবরের উপর সৌধ নির্মাণের মধ্যে নেই। কারণ যে ব্যক্তি নবী ও আল্লাহর ওলীদের মাজার ও সৌধকে সম্মান প্রদর্শন করে সে তাঁদের উপাস্য ও প্রতিপালক হওয়ার বিশ্বাস রাখে না।

দ্বিতীয়ত আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে কোন হারামের সকল প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কর্ম হারাম নয়, বরং যে প্রস্তুতি তাকে নিশ্চিত ভাবে হারামে ফেলে তাই শুধু হারাম। অর্থাৎ যদি কেউ শিরক করার উদ্দেশ্যেই কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করে তবেই তা হারাম হবে। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করে তবে তা হারাম তো হবেই না, বরং মুস্তাহাব বলে পরিগণিত হবে।

২। কবরের উপর সৌধ নির্মাণ মুশরিকদের কাজ! [২০৫]

উত্তর : প্রথমত মূর্তিপূজকরা (মুশরিকরা) তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করত এ বিশ্বাসে যে তারা তাদের প্রভু ও প্রতিপালক। (আমরা অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা করেছি) এ কারণেই ইসলাম তাদের সমালোচনা করেছে কিন্তু মুসলমানরা এরূপ বিশ্বাস নিয়ে তাদের মৃতদের কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করে না।[২০৬]

দ্বিতীয়ত কাফের বা মুশরিকদের সাথে যে কোন প্রকার মিল থাকলেই তা হারাম হতে পারে না। যদি তা এমন কোন বিষয় হয় যা কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই প্রচলিত এবং তাদের ধর্ম ও আচারসমূহকে পুনর্জীবন দানের লক্ষ্যে করা হয় তবেই তা হারাম বলে বিবেচিত। আমরা 'উৎসব পালন' সম্পর্কিত পরবর্তী আলোচনায় এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

৩। কবরের উপর সৌধ নির্মাণ নিষিদ্ধ বিদআতী কাজ?

উত্তর : আমরা অন্যত্র সুন্নাত ও বিদআতের মধ্যকার পার্থক্যের আলোচনায় উল্লেখ করেছি বিদআতের দু'টি মৌলিক দিক রয়েছে তা হলো ধর্মের মধ্যে কম বা বেশি করা এবং সে বিষয়টি নতুন কিছু হওয়া যার সপক্ষে সাধারণ বা বিশেষ কোন শারয়ী দলিল নেই। কিন্তু কবরের উপর সৌধ নির্মাণের বৈধতার বিষয়ে একদিকে বিশেষ দলিল রয়েছে যেমন সুন্নাত ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অন্যদিকে সর্বজনীন বৈধতার দলিলও রয়েছে।

৪। কবরের উপর সৌধ নির্মাণের নিষিদ্ধতার বিষয়ে আলেমদের মধ্যে সর্বজনীন ঐকমত্য রয়েছে:

জান্নাতুল বাকীতে বিদ্যমান সৌধসমূহের ব্যাপারে সৌদী রাজদরবারের প্রশ্নের জবাবে মদীনা শরীফের ওয়াহাবী আলেমগণ বলেছেন : 'আলেমদের সর্বসম্মত মত হচ্ছে কবরের উপর সৌধ নির্মাণ নিষিদ্ধ। কারণ তার নিষিদ্ধতার বিষয়ে সহীহ্ হাদীসসমূহ রয়েছে.।'[২০৭]

উত্তর : প্রথমত দাবীকৃত ইজমা বা আলেমদের ঐকমত্যের বিষয়টি হাদীস নির্ভর। আমরা পরবর্তীতে এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো নিয়ে আলোচনা করব। হাদীস নির্ভর ইজমার ক্ষেত্রে যদি উপস্থাপিত হাদীস দুর্বল হয় তবে সেই ইজমার কোন মূল্য থাকে না।

দ্বিতীয়ত দাবীকৃত ইজমাকে আমরা সম্ভাব্য তিন ভাগে ভাগ করতে পারি :

ক) ইজমায়ে তাকদীরি (বিষয়বস্তু ভিত্তিক ইজমা) : এরূপ ইজমায় কয়েকটি হাদীসের বিষয়বস্তু হতে ধারণার ভিত্তিতে ফতোয়া দেওয়া হয়। এরূপ ইজমা অগ্রহণযোগ্য। কারণ যে সকল

হাদীসের ভিত্তিতে ফতোয়া দেওয়া হবে তার সনদ ও দালালাতের (সূত্র ও বিষয়বস্তু) বিশুদ্ধতার উপরও ফতোয়া নির্ভরশীল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উভয় দৃষ্টিতেই তা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত।

খ) ইজমায়ে মুহাক্কাক (প্রতিষ্ঠিত ইজমা) : প্রতিষ্ঠিত ইজমা হলো সকল আলেম ঐ বিষয়ে একমত যে, তা হারাম ও নিষিদ্ধ। কবরের উপর সৌধ নির্মাণ যেমন হারাম তা বিদ্যমান রাখাও হারাম এ উভয় ক্ষেত্রে তারা একমত। প্রতিষ্ঠিত ইজমার সম্ভাবনাও এক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য। কারণ অধিকাংশ আলেম সর্বজনীনভাবে কবরের উপর সৌধ নির্মাণের বিষয়ে কথা বলেছেন অথবা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আল্লাহর ওলীদের কবর নিয়ে।

আমরাও আল্লাহর ওলী ভিন্ন সাধারণ মুমিনদের কবরের উপর সৌধ নির্মাণের বিষয়টি মাকরূহ হওয়ায় বিশ্বাসী। দ্বিতীয়ত অধিকাংশ আলেম সৌধ নির্মাণের বিষয়টিকে নিষিদ্ধ বলেন না, বরং তারা মাকরূহ বলে মনে করেন এমনকি কেউ কেউ মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি সমর্থন করেন না।

যারা হারাম হওয়ার বিষয়টি সমর্থন করেন না :-

১। আবদুর রহমান জাযিরী বলেছেন : ‘কবরের উপর গম্বুজ বা সৌধ নির্মাণ মাকরূহ।’[২০৮]

২। নাভাভী শারহে সহীহ মুসলিম গ্রন্থে বলেছেন, ‘যদি কোন কবর ঐ ব্যক্তির মালিকানাধীন স্থানে হয় তবে তার উপর সৌধ নির্মান মাকরূহ। যদি জনসাধারণের চলার পথে অবস্থিত হয় তবে তা নির্মাণ হারাম।’[২০৯]

৩। মালিকী মাজহাবের প্রধান জনাব মালিক ইবনে আনাস হতে বর্ণিত হয়েছে, ‘কবরের উপর সৌধ নির্মাণ ও চুনকাম করা আমার মতে মাকরূহ।’[২১০]

৪। শাফেয়ী বলেছেন, ‘আমি পছন্দ করি কবরের উপর সৌধ নির্মিত ও তাতে চুনকাম করা না হোক। কারণ এটি কবরের সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে করা হয় অথচ কবর সৌন্দর্য ও অলংকৃত করার স্থান নয়।’

৫। ইবনে হাজাম বলেছেন, ‘যদি কোন কবরের উপর সৌধ বা স্তম্ভ নির্মাণ করা হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই।’[২১১]

৬। জনাব নাভাভী কবরের উপর সৌধ নির্মাণ মাকরূহ বলেছেন কিন্তু তিনি বলেছেন, আবু হানিফার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি মাকরূহ মনে করেন না।[২১২]

কবরের উপর সৌধ নির্মাণের বিষয়ে যে মাকরূহ ফতোয়া দেয়া হয়েছে তা মূলত সাধারণ মুমিনদের কবরের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে কিন্তু আল্লাহর ওলিগণের কবর এ সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম।

আবদুল গণি নাবলসী তাঁর 'আল হাদীকাতুন্নাদীয়া' গ্রন্থে বলেছেন, 'কবরের নিকট মোমবাতি জ্বালানো ও তা আলোকিত করা মাকরূহ এজন্য যে, তা নিরর্থক তবে তা যদি কোন ভাল উদ্দেশ্যে যেমন... কোন আল্লাহর ওলী বা সম্মানিত বিশেষ আলেমের রূহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে করা হয় তবে তাতে অসুবিধা নেই।'[২১৩]

গ) ইজমার অর্থ এখানে মুসলমানদের অনুসৃত সর্বজনীন রীতি যা রাসূলের ইন্তেকালের সময় হতে বর্তমান পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। আমরা পূর্বেই প্রমাণ করেছি মুসলমানদের সর্বজনীন অনুসৃত রীতি এর বিপরীত বিষয়কে প্রমাণ করে। কারণ মুসলমানদের ইতিহাসের উপর চোখ বুলালে আমরা দেখি কবরের উপর সৌধ নির্মাণ তাদের সর্বকালীন অনুসৃত রীতি।

৫। কবরের উপর সৌধ নির্মাণের নিষিদ্ধতার পক্ষে উপস্থাপিত হাদীসসমূহ :

কবরের উপর সৌধ নির্মাণের নিষিদ্ধতার বিষয়ে আহলে সুন্নাতের সূত্রে উদ্ধৃত ওয়াহাবীদের হাদীসভিত্তিক দলিলগুলো নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করব।

১। আবিল হায়াজের হাদীস : সহীহ্ মুসলিম ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া, আবু বকর ইবনে আবি শাবি এবং জুহাইর ইবনে হারব ওয়াকী হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি হাবীব ইবনে আবি সাবিত হতে, তিনি আবি ওয়ায়িল হতে তিনি আবিল হায়াজ আসাদী হতে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) তাকে বলেছেন : 'তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো যা করতে মহানবী (সা.) পাঠিয়েছিলেন এবং তা হলো যে কোন মূর্তিই (ভাস্কর্যই) পাও না কেন তা ধ্বংস করবে এবং যে কোন অসমতল এবং উচ্চ কবর পাবে তা সমতল করবে।'[২১৪]

হাদীসটি সনদ ও দালালাতের দিক থেকে দুর্বল ও জায়িফ হিসেবে পরিগণিত।

ক) সনদের মূল্যায়ন : বর্ণনাকারী কয়েকজন রাবী দুর্বল বলে ঘোষিত হয়েছেন। যেমন, ওয়াকী ইবনে জাবরা, ইবনে মালিহ্ রাওয়াসী কুফীকে অনেকেই দুর্বল বর্ণনাকারী বলেছেন।[২১৫]

সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনে মাসরুফ সাওবী কুফী যাকে ইবনে হাজার ও যাহাবী হাদীসের সনদ জালকারী হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন অর্থাৎ যে বর্ণনাকারীকে সে দেখে নি তার নামে হাদীস বর্ণনার দাবী সে করত।[২১৬]

হাবীব ইবনে আবি সাবিত কাইস ইবনে দিনার সম্পর্কেও একই অভিযোগ রয়েছে।[২১৭]

আবু ওয়ায়িল আসাদী হযরত আলীর বিরোধী ছিল।[২১৮] সে কুফায় আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সহযোগী ছিল এবং তার অত্যাচার ও লুটপাটের ইতিহাস কারো নিকট অজানা নয়।

আবুল হায়াজ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ নন। এ কারণে আল্লামা সুয়ূতী সুনানে নাসায়ীর ব্যাখ্যাগ্রন্থেও টীকায় বলেছেন, ‘হাদীস গ্রন্থসমূহে এ হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন হাদীস তার হতে বর্ণিত হয় নি এবং ইবনে হাব্বান ব্যতীত অন্য কেউই তাকে বিশ্বস্ত বলেন নি। ইবনে হাব্বান সাধারণত অজ্ঞাত রাবীদের বিশ্বস্ত বলার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ।

হাদীসবিদ আজলীও তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন যিনি তাবেয়ীদের গড়পড়তা হারে বিশ্বস্ত বলেছেন এ কারণে যে, তাদের প্রতি তার বিশেষ ভাল ধারণা ও সুদৃষ্টি ছিল।[২১৯]

খ) দলিলের নির্ভরযোগ্যতা : উল্লিখিত হাদীসটিতে দলিলের দৃষ্টিতেও অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে।

১। হাদীসের সনদ বর্ণনার বিষয়বস্তুতে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন একটি হাদীসে আবিল হায়াজ বলেছে, ‘হযরত আলী আমাকে বলেছেন’, অন্য হাদীসে আবি ওয়ায়িল বর্ণনা করেছে, ‘আলী আবিল হায়াজকে বলেন’, অন্যত্র বলেছে, ‘আলী আবিল হায়াজকে বলেন, আমি অবশ্যই তোমাকে প্রেরণ করব। আমরা জানি হাদীসের সনদ ও বিষয়বস্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকলে তা হাদীসের নির্ভরযোগ্যতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে।

২। হাদীসটিতে পৃথিবীর সকল পাকা কবর ভাঙ্গার ও ধ্বংস করার কথা বলা হয় নি, বিশেষ বিষয়ে তাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সম্ভবত কবরগুলো মুশরিকদের (মূর্তিপূজক) ছিল এবং তারা সেখানে উপাসনার জন্য যেত এ কারণে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যদি ধরেও নেই তা মুসলমানদের কবর ছিল তদুপরি তার সঙ্গে আল্লাহর ওলীদের কবরের কোন সম্পর্ক নেই; কারণ তাঁদের কবর আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে অধিক মনোযোগী হওয়ার লক্ষ্যে নির্মিত হয়ে থাকে যার মধ্যে শিরক ও অংশীদারিত্বের কোন সম্পর্ক নেই।

৩। আভিধানিকগণ (تسويه) শব্দটি যদি কোন সহযোগী শব্দ ছাড়া একাকী উল্লিখিত হয় তবে তার অর্থ শুধুই সমতল করা। এই হাদীসটিতে শব্দটি এভাবেই এসেছে, ফলে অনুরূপ অর্থই শুধু প্রকাশ করে না। কারণ হাদীসটিতে বলা হয় নি ভূমি সমতল কর। তাই হাদীসটির অর্থ হবে বক, মাছের বা উটের পিঠের ন্যায় কবরসমূহকে সমতল করে দাও। কারণ কোন কোন হাদীসে এসেছে শহীদদের কবরসমূহ সে সময় উটের পিঠের ন্যায় উঁচু ছিল।[২২০]

৪। হাদীসটিতে কবরের উপর নির্মিত ছাদ, দেয়াল ইত্যাদি ধ্বংস করার কোন কথাই আসে নি।

৫। উপরন্তু উপরিউক্ত হাদীসটি ইসলামের ইতিহাসের সকল পর্যায়ে মুসলিম মনীষী ও আলেমদের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য ছিল এবং তারা এর উপর আমল করেন নি। এ কারণে হাদীসটি পালনীয় নয়।

২। জাবির হতে বর্ণিত হাদীস : মুসলিম আবু বাকর ইবনে শাইবা হতে, তিনি হাফস ইবনে গিয়াম হতে, তিনি জাবির হতে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) কবরের উপর চুনকাম করা, কিছু লেখা ও সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।[২২১] একই ভাবার্থে কয়েকটি হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসগুলোতে বেশ কিছু দুর্বলতা রয়েছে যে কারণে নির্ভরযোগ্যতা হারিয়েছে।

প্রথমত এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর মধ্যে সবকটিতেই উপরিউক্ত তিন রাবী অর্থাৎ জাবির, আবুজ জুবাইর ও ইবনে জুরাইহ একত্রে অথবা এককভাবে রয়েছেন অর্থাৎ কেবল তারাই এককভাবে অথবা এককসূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার বলেছেন, ইয়াহিয়া ইবনে মুঈনকে ইবনে জুরাইহের হাদীসটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বলেন যে, তার বর্ণিত সকল হাদীস জায়িফ (দুর্বল)।'[২২২]

আহমাদ ইবনে হাম্বাল হতে ইবনে জুরাইহ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, সে মুনকার[২২৩] হাদীস বর্ণনা করে।[২২৪]

মালিক ইবনে আনাস তার সম্পর্কে বলেছেন, 'ইবনে জুরাইহ ঐ ব্যক্তির সাথে তুলনীয় যে রাত্রে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহে লিপ্ত অর্থাৎ সে সবধরনের (সহীহ্ ও দুর্বল) হাদীস বর্ণনা করে।'[২২৫]

আবুজ জুবাইর সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে সে দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী। আহমাদ ইবনে হাম্বাল আইয়ুব হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবুজ জুবাইর দুর্বল বর্ণনাকারী।

শোবা বলেছেন, 'আবুজ জুবাইর ঠিক মতো নামাজ পড়তো না এবং সে অন্যদের উপর অপবাদ আরোপ করে থাকে।'

আবু হাতেম রাজী বলেছেন, 'তার বর্ণিত হাদীস লিখতে অসুবিধা নেই তবে তা প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা যাবে না।'[২২৬]

দ্বিতীয়ত জাবির বর্ণিত হাদীসটির বিভিন্ন বর্ণনায় চরম অমিল রয়েছে। কারণ জাবির হতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় কবরে চুনকাম করা ও তার উপর ভর দেয়া হতে নিষেধ করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় কবরে চুনকাম করা, লেখা, সৌধ নির্মাণ, হাঁটা- চলা করা হারাম বলা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এগুলো ছাড়াও কবর জিয়ারত হারাম বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এত ব্যাপক ভিন্নতা হাদীসের বিশ্বাসযোগ্যতাকে শূণ্যের কোঠায় নিয়ে আসে।

তৃতীয়ত যদি ধরে নেই হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও কোন ভিন্নতা নেই ও হাদীসে কেবলমাত্র কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছে কিন্তু হাদীসে হারাম হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা নেই। কারণ নিষেধ দু'প্রকারের (১) কোন কাজ

অপছন্দনীয় (মাকরূহ) হওয়ার কারণে নিষেধ করা হয়েছে যা ইসলামের অনেক বিধানের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। (২) হারামের নিষেধাজ্ঞা, যদিও সাধারণত নিষেধাজ্ঞা হারামের প্রতিই ইঙ্গিত করে কিন্তু উপরিউক্ত হাদীসটি হতে ফকীহ ও আলেমগণ হারাম নয়, বরং মাকরূহ হওয়ার সম্ভাবনাকেই গ্রহণ করেছেন। এ কারণেই আমরা দেখি তিরমিযী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উপরিউক্ত হাদীসটিকে 'কবরের উপর সৌধ নির্মাণ মাকরূহ' শিরোনামের অধীনে এনেছেন। সহীহ্ ইবনে মাজার একজন ব্যাখ্যাকারী হাকিম নিশাবুরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ কারণেই মুসলমানদের মধ্যে কেউই এ হাদীসটির উপর আমল করেন নি।

যদি ধরেও নিই এ হাদীস হতে বাহ্যিকভাবে বিষয়টি মাকরূহ হওয়া প্রমাণিত হয় তদুপরি যখন বিষয়টি আল্লাহর ওলীদের ক্ষেত্রে হবে তখন তাঁর নিদর্শনকে পুনর্জ্জীবিতকরণ ও সম্মান প্রদর্শনের আওতায় তা মাকরূহ থাকবে না, বরং মুস্তাহাব হয়ে যাবে।

এমতাবস্থায় কি করে ওয়াহাবীরা এ সকল হাদীসের ভিত্তিতে এ বিষয়টিকে হারাম ঘোষণা করে কবরের উপর সৌধ নির্মাণকারীকে মুশরিক বলে অভিহিত করার সাহস পাচ্ছে?

৩। আবু সাঈদ খুদরী ও উম্মে সালামার হাদীস : ওয়াহাবীরা অপর যে দু'টি হাদীসকে তাদের ফতোয়ার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে তার একটি হলো আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, 'মহানবী (সা.) কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।'[২২৭] অপর হাদীসটি হলো উম্মে সালামা বলেছেন, 'রাসূল (সা.) কবরের উপর সৌধ নির্মাণ চুনকাম করতে নিষেধ করেছেন।'

প্রথম হাদীসটিতে একজন অপরিচিত রাবীর উপস্থিতির (যার বিশ্বস্ততার বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই) কারণে তার নির্ভরযোগ্যতা থাকে না।

দ্বিতীয় হাদীসটিতে আবদুল্লাহ্ ইবনে লাহিয়া রয়েছে যার সম্পর্কে যাহাবী ইবনে মুঈন হতে বলেছেন যে, সে দুর্বল এবং তার বর্ণিত হাদীসের উপর নির্ভর করা যায় না। তাছাড়া ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ হতেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইবনে লাহিয়াকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

৬। জান্নাতুল বাকীর কবরস্থানটি ওয়াকফ সম্পত্তি :

ওয়াহাবীরা জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত আহলে বাইতের ইমামদের কবরের চিহ্নসমূহকে ধ্বংস করার সপক্ষে এ যুক্তি উপস্থাপন করে যে, জান্নাতুল বাকীর কবরস্থান ওয়া ফ সম্পত্তি এবং ইমামদের কবরের উপর নির্মিত গম্বুজসমূহ ওয়াকফের নীতির পরিপন্থি। তাই মুসলমানদের নেতার (কতৃত্বশীল ব্যক্তির) উচিত তা ধ্বংস করা।

তাদের এ যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য হলো : প্রথমত কোন হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থেই উল্লিখিত হয় নি যে, বাকীর কবরস্থান ওয়া ফ সম্পত্তি। কারণ এ সময় মদীনা ও হিজাযের অন্যান্য স্থানের ভূমির এত মূল্য ছিল না যে কেউ তা ওয়া ফ করবে।

দ্বিতীয়ত সামহুদী হতে বর্ণিত হয়েছে বাকীতে যে স্থানে ইমামদের কবর রয়েছে তা হযরত আলীর ভ্রাতা আকীল ইবনে আবি তালিবের নিজস্ব ঘর ছিল। সামহুদী বলেছেন, ‘আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কবর ফাতিমা বিনতে আসাদ ইবনে হাশেমের কবরের পাশে অবস্থিত এবং তিনি আকীলের গৃহে কবরস্থ হয়েছিলেন।’[২২৮] এতদসত্বেও ওয়াহাবীরা সম্পত্তিটি ওয়া ফ হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে আহলে বাইতের পবিত্র ইমামদের কবরের গম্বুজগুলোকে ধ্বংস করেছে।

আল্লাহর ওলীদের সৌধের ইতিবাচক প্রভাবসমূহ

যেহেতু মহানবীর স্থলাভিষিক্ত ও মনোনীত প্রতিনিধিগণ আল্লাহর ওলী এবং ইসলামের পথে সর্বপ্রকার আত্মত্যাগ করেছেন এ কারণে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা মুসলমানদের জন্য আদর্শ। নিঃসন্দেহে মনস্তাত্ত্বিক ও শৈি ক কর্মের মাধ্যমে ইসলামের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বদের জাগরিত রাখা ইসলামের সাথে মুসলমানদের বন্ধনকে দৃঢ় করে। যে ব্যক্তি জীবনে অন্তত একবার মক্কা ও মদীনায় জিয়ারতে যাবে এবং সেখানে অবস্থিত ইসলামের প্রাথমিক যুগের নিদর্শনসমূহ ও মহান ব্যক্তিবর্গের জৌলুসপূর্ণ রওজা দর্শন করবে তাঁদের মহান আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করবে ও তাঁদের মর্যাদা ও সম্মান তাদের অন্তরপটে প্রতিফলিত হবে। ফলে তারা তাদের প্রভু আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে এই বলে যে, ঐ মহান ব্যক্তিবর্গের পথে চলবে এবং দৃঢ় শপথ নেবে তাঁদের পথে অবিচল থাকার। এটি ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের চির জাগরুক রাখার একটি পদ্ধতি। যে কেউ আল্লাহর ওলীদের কবর, গম্বুজ ও সৌধ দেখে তাঁদের শিক্ষার বিষয়ে প্রত্যয় অর্জন করে।

খ্রি ান বিশ্ব একটি বিশেষ সময় হযরত ঈসার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছিল, কারণ তাঁর স্মৃতির কোন চিহ্নই বর্তমান নেই। একজন মার্কিন ঐতিহাসিক তার ‘সভ্যতার ইতিহাস’ গ্রন্থে হযরত ঈসার বিষয়ে খ্রি বিশ্ব যে দু’শ বছর সন্দেহে পতিত হয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন।

নেপোলিয়ান ১৮০৮ সালে একজন জার্মান ঐতিহাসিক উইলে ডকে প্রশ্ন করেন হযরত ঈসা যে এক ঐতিহাসিক সত্য তা সে বিশ্বাস করে কি না?

কিন্তু ইতিহাসের পরিক্রমায় মুসলমানগণ সবসময় মাথা উঁচু করে রয়েছে। কারণ আমাদের ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের কবরসমূহ এখনও বিদ্যমান এবং কিছুদিন পরপরই তাঁদের কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে আমরা তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ককে ও পথ চলার প্রতিশ্রুতিকে নবায়ন করি যে পথ অতিক্রম করলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর সন্তুষ্টি, পূর্ণতা ও বেহেশতে পৌঁছা যাবে।

আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট মসজিদ নির্মাণ ও আলো জ্বালানো

সাধারণভাবে সকল মুসলমানই আল্লাহর ওলীদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকে জায়েয মনে করেন ও তাঁদের মধ্যে এরূপ কর্ম প্রচলিত রয়েছে, এ কাজটি তারা এ কারণে করেন যে, আল্লাহর ওলীদের দাফনকৃত স্থানটি ও তাঁদের রওজা পবিত্র স্থান ও সেখান থেকে বরকত লাভ করা যায়। কিন্তু ওয়াহাবীগণ আল্লাহর ওলীদের কবরের উপর সৌধ নির্মাণ যেমনভাবে হারাম মনে করে তাদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকেও তদ্রুপ শিরক হওয়ার সম্ভাবনায় হারাম মনে করে। এখানে আমরা এ বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করব।

ওয়াহাবীদের ফতোয়াসমূহ

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, ‘রাসূল (সা.) তাঁর কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ কেউ যেন নামাজের সময় সেখানে গিয়ে নামাজ ও দোয়া না পড়ে। যদিও কেউ আল্লাহর ইবাদতের নিয়তে সেখানে যায় তা করা উচিত নয়। কারণ ঐ স্থানে গমন শিরকে পতনের কারণ হতে পারে। সম্ভাবনা রয়েছে কবরের নিকট মানুষ ঐ মৃত ব্যক্তির জন্য নামাজ পড়বে ও দোয়া করবে এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। তাই আল্লাহর ওলীদের কবরের পাশে মসজিদ বানানো হারাম। সুতরাং মসজিদ নির্মাণের বিষয়টি মুস্তাহাব হলেও যেহেতু এরূপ স্থানে নির্মিত মসজিদ মানুষদের শিরকে ফেলতে পারে তাই তা সম্পূর্ণ হারাম।’[২২৯]

অন্যত্র বলেছেন, ‘আলেমগণ এ বিশ্বাস রাখেন যে, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা হারাম।’[২৩০]

কোরআন ও আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট মসজিদ নির্মাণ

মহান আল্লাহ আসহাবে কাহফের ঘটনায় বর্ণনা করেছেন :

﴿وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾

“এবং এমনিভাবে তাদের বিষয়ে আমি অবহিত করলাম যাতে করে তারা জানতে পারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতের বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিল, তখন তারা বলল তাঁদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে অধিকতর অবগত। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল : আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে (কবরের নিকট) মসজিদ নির্মাণ করব।” [২৩১]

মহান আল্লাহ এই আয়াতে তাদের বিষয়ে মানুষদের অবগতির ধরন সম্পর্কে বলেছেন। তারা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রস্তুতি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো। কেউ বলল : ‘তাদের কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করা উচিত’, ‘কেউ বলল : ‘তাদের কবরের নিকট মসজিদ নির্মাণ করব’, ফলশ্রুতিতে শেষোক্তদের মতই প্রবল হলো।

ফখরুদ্দীন রাজী বলেছেন, ‘কারো কারো মতে যে দলটি মসজিদ নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছিল তারা ছিল মুমিনদের শাসক ও আসহাবে কাহফের সমর্থক। কারো কারো মতে শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এ পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে করে সেখানে ইবাদত করতে পারেন এবং মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে আসহাবে কাহফের স্মৃতিকে জাগরুক রাখতে পারেন।[২৩২]

আবু হায়ান আন্দালুসী বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সৌধ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিল সে কাফের অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। কারণ সে এ কর্মের মাধ্যমে চেয়েছিল কুফরের কে স্থাপন করতে। কিন্তু মুমিনরা মসজিদের প্রস্তাব দানের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্যে ও পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।’[২৩৩]

আবুস সাউদ ও জামাখশারীও উপরোক্ত মতটি সমর্থন করেছেন অর্থাৎ বলেছেন যে, আসহাবে কাহ্‌ফের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব দানকারী মুমিন ছিলেন।[২৩৪]

অবশ্য আমরা অবগত যে, কোরআন গ র গ্রন্থ নয়। তাই কোন কাহিনী বর্ণনা করলে তার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানরা যেন তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

যেহেতু মহান আল্লাহ্ আসহাবে কাহ্‌ফের কবরের নিকট মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন নি এবং এরূপ কর্মকে শিরক মনে করেন নি সেহেতু আমরা এই নিরব সমর্থনকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নিশ্চিত সম্মতি ধরে নিতে পারি।

আল্লাহ্‌র ওলীদের কবরের নিকট মসজিদ নির্মাণ : মুসলমানদের চিরাচরিত রীতি

আমরা মুসলমানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখব আল্লাহ্‌র ওলীদের কবরের নিকট মসজিদ নির্মাণ করা মুসলমানদের চিরাচরিত রীতির অন্তর্ভুক্ত।

মুসলিম ঐতিহাসিকগণ আবু জান্দাল ও আবু বাসিরের একত্রে যাত্রার একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আবু বাসির মহানবীর পত্র আবু জান্দালের নিকট পৌঁছানোর পরপরই পৃথিবী হতে বিদায় নেন। যে স্থানে আবু বাসির আবু জান্দালকে পত্র পৌঁছিয়ে মৃত্যুবরণ করেন আবু জান্দাল সেখানেই তাকে দাফন করেন ও তাঁর কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করেন।[২৩৫]

ওয়াহাবীদের উপস্থাপিত দলিলসমূহের পর্যালোচনা : আল্লাহ্‌র ওলীদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ হারাম হওয়ার বিষয়ে ওয়াহাবীরা যে সকল দলিল উপস্থাপন করেছে আমরা এখানে তা নিয়ে আলোচনা করব।

১। হাদীস ভিত্তিক প্রমাণ :

ওয়াহাবীরা তাদের দাবীর সপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছে :

ক) জুনদাব ইবনে আবদুল্লাহ্ বাজালী বলেছেন, 'মহানবীর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তাঁর হতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে, জেনে রাখ, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের প্রতি প্রেরিত নবী রাসূলদের

কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল, কিন্তু তোমরা এরূপ কর না। আমি তোমাদের তা করতে নিষেধ করছি।’[২৩৬]

খ) মহানবী (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তি বানিও না। আপনি লানত (অভিসম্পাত) করুন সেই সম্প্রদায়গুলোকে যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল।’[২৩৭]

গ) মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা হাবশায় দেখা এক মসজিদের বা উপাসনালয়ের কথা বললেন, রাসূল (সা.) তা শুনে বললেন, ‘ঐ সম্প্রদায়ের রীতি হলো যখন তাদের মধ্যে কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে ও তার মধ্যে মূর্তি স্থাপন করে। তারা কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট লোক হিসেবে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে।’[২৩৮]

ঘ) সহীহ বুখারীতে রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে ‘আল্লাহ ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর অভিশম্পাত বর্ষন করুন, কারণ তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে।’[২৩৯]

উপরিউক্ত হাদীসসমূহের প্রমাণ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য :

প্রথমত হাদীসগুলোর উদ্দেশ্য বুঝতে হলে ওলীদের কবরের পাশে ইহুদী ও খ্রি ানদের সৌধ নির্মাণের কারণটি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষন করতে হবে। কারণ মহানবী (সা.) ইহুদী ও খৃ ানরা যে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৌধ নির্মাণ করত সেই কারণে তা করতে নিষেধ করেছেন। আমরা হাদীসগুলো থেকে বুঝতে পারি ইহুদী ও খ্রি ানরা আল্লাহর ওলীদের কবরকে কিবলা ও মসজিদ বানাত এবং তাদের কবরের উদ্দেশ্যে সিজদা করত অর্থাৎ তারা আল্লাহর ওলীদের ইবাদত করত। এ জন্যই মহানবী (সা.) তাদের এ কর্মের তীব্র সমালোচনা করেছেন ও মুসলমানদেরকে অনুরূপ করতে নিষেধ করেছেন। তাই যদি আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট তাদের হতে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর প্রতি মনোযোগ ও ধ্যানকে গভীর করতে মসজিদ নির্মাণে কোন অসুবিধা নেই। কারণ ইবাদত ও নামাযের নিয়তে তা করা হয় না (তবে যদি কেউ তাদের সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তা নির্মাণ করে অবশ্যই তা হারাম।)। তাই বলা যায় উল্লিখিত হাদীসগুলো

আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু বহির্ভূত। উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামার হাদীসে ইহুদী ও খ্রি নদের ঐরূপ নিয়ত ও কর্মের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

বাইদ্বাভী উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'যেহেতু ইহুদী ও খ্রি নরা আল্লাহর ওলীদের কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সিজদা করত ও তাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করত, এ কারণেই মুসলমানদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সকলের নিকট স্পষ্ট যে ঐরূপ কর্ম সুস্পষ্ট শিরক। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর ওলীদের কবর হতে বরকত লাভের নিয়তে তার নিকট মসজিদ নির্মাণ করে তবে তা উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।'

সুনানে নাসায়ীর ব্যাখ্যাকারী সিন্দী বলেছেন, 'রাসূল (সা.) নিজ উম্মতকে আল্লাহর ওলীদের প্রতি ইহুদী ও খ্রি নদের ন্যায় আচরণ করতে নিষেধ করেছেন হোক তাদের সামনে সম্মান প্রদর্শনের নিয়তে সিজদাবনত হওয়া বা তাদের কবরকে কিবলা বানিয়ে নামায পড়া উভয় ক্ষেত্রেই তাতে বারণ করেছেন।'[২৪০]

দ্বিতীয়ত হাদীসগুলোতে আল্লাহর ওলীদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু কবরের পাশে মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে কিছু বলা হয় নি।

তৃতীয়ত হাদীসগুলোতে যে নিষেধের কথা এসেছে তা হারাম না হয়ে মাকরূহও হতে পারে। এ কারণেই বুখারী ঐ হাদীসগুলোকে কবরের স্থানকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ মাকরূহ হওয়ার অধ্যায়ের অধীনে এনেছেন এবং এরূপ নিষেধকে মাকরূহে তানযীহি অর্থে গ্রহণ করেছেন।[২৪১]

শাইখ আবদুল্লাহ্ হারভী উল্লিখিত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞা তাদের উপর প্রযোজ্য যারা আল্লাহর ওলীদের কবরের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ইবাদতের লক্ষ্যে সিজদা করে। যদি কবরের স্থান খোলা ও প্রকাশিত থাকে তবেই সেখানে নামাজ পড়া হারাম আর যদি উন্মুক্ত না থাকে তবে সেখানে নামাজ পড়া হারাম নয়।'[২৪২]

আবদুল গনি নাবলুসী হানাফী বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি কোন সৎকর্মশীল বান্দার কবরের নিকট মসজিদ নির্মাণ করে এ উদ্দেশ্যে যে, তার কবর হতে নামাযের সময় বরকত লাভ করবে এবং মৃত ব্যক্তির প্রতি নামাযের সময় সম্মান প্রদর্শনের কোন নিয়ত তার না থাকে তবে কোন

অসুবিধা নেই। কারণ হযরত ইসমাঈলের কবর মসজিদুল হারামে (বায়তুল্লাহ বা কাবা ঘর) হাতিমের সন্নিকটে অবস্থিত এবং ঐ স্থানটি নামায পড়ার শ্রেষ্ঠ স্থানসমূহের অন্তর্ভুক্ত।'[২৪৩]

আল্লামা বদরুদ্দীন হাউসী বলেছেন, 'কবরস্থানকে মসজিদ বানানোর অর্থ হলো কোন নামাজী তাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করে নামাজ পড়বে।'[২৪৪]

২। প্রতিবন্ধকতার নীতির (কায়েদায়ে সাদ্দে যারাঈ) দলিল :

আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট মসজিদ নির্মাণের নিষিদ্ধতার সপক্ষে ওয়াহাবীদের অন্যতম দলিল হলো প্রতিবন্ধকতার নীতি। এ নীতিটি হলো যদি কোন কর্ম বস্তুত মোবাহ বা মুস্তাহাব হয় কিন্তু তার মাধ্যমে হারামে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে ঐ কর্মটি হারাম বলে পরিগণিত হবে যাতে করে কেউ হারামের দিকে পরিচালিত না হতে পারে।

ইবনে কাইয়্যেম জাওযীয়া উপরিউক্ত নীতির সপক্ষে অনেকগুলো দলিল এনেছেন যেমন পবিত্র কোরআনের আয়াতটি যে,

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

"*যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করে তাদেরকে (উপাস্যদের) গালি দিও না। কারণ এতে তারা শত্রুতাবশত জ্ঞানহীনতার কারণে আল্লাহকে গালি দিবে।*" (সূরা আনআম : ১০৮)

এ আয়াতে যেহেতু মূর্তিকে গালি দিলে মুশরিকরা অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিতে পারে তাই মূর্তিকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

অন্যত্র নারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

"*(নারীদের বলুন) তারা যেন তাদের পদযুগল দ্বারা মাটিতে আঘাত না করে (শব্দ না করে হাটে) যাতে করে অন্য কেউ তাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে না পারে।*" (সূরা নূর : ৩১)

এ আয়াতে নারীরা তাদের যে সৌন্দর্য গোপন রাখে তা প্রকাশিত যাতে না হয় ও অন্যরা সে সম্পর্কে জানতে না পারে সেজন্য মাটিতে পদাঘাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা উপরিউক্ত নীতির সপক্ষে কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিও উপস্থাপন করেছেন।[২৪৫]

আমরা তাদের যুক্তির বিরুদ্ধে বলব :

কোন ওয়াজিবের প্রাথমিক শর্ত তখনই ওয়াজিব হবে যখন ঐ প্রাথমিক শর্ত ওয়াজিবের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হবে এবং অবধারিত ও অবিচ্ছিন্নভাবে ঐ শর্ত ঐ ওয়াজিবে পৌঁছার কারণ হবে। তাই যে কোন প্রাথমিক শর্তই শর্ত হওয়ার কারণে ওয়াজিব বলে পরিগণিত হয় না। যেমন ছাদের উপর উঠা যদি আমাদের উপর ওয়াজিব হয় তবে যেহেতু ছাদে উঠার শর্ত হল মই বা সিঁড়ি সংযোজন সেহেতু ছাদে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় মই বা সিড়ি সংযোজন আমাদের জন্য ওয়াজিব হবে। কোন বিষয় হারাম হওয়ার ক্ষেত্রেও তাই অর্থাৎ যে শর্তটি আমাদের সরাসরি হারামে ফেলে ও হারামের অবধারিত শর্ত বলে পরিগণিত হয় শুধু সেরূপ শর্তই হারাম।

সুতরাং আল্লাহর ওলীদের কবরের পাশে মসজিদ নির্মাণ যদি শিরক করা ও তাদের উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন ও নামায আদায়ের নিয়তে না হয় তবে এরূপ মসজিদ নির্মাণে কোন সমস্যা ও বাধা নেই।

যদিও এমন হয় যে কেউ কেউ নামাজ পড়ার সময় তাদের সম্মান প্রদর্শনের নিয়তের কথা চিন্তা করে ও সে উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে কিন্তু যেহেতু মসজিদটি সেরূপ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় নি, তাই এ ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। যদি আমরা এ স্বতঃসিদ্ধ রীতিটি মেনে না নেই, তবে আমাদের প্রতিদিনের লেনদেনের অনেক বিষয়বস্তুই হারাম বলে পরিগণিত হবে বিশেষত যে মাধ্যম ও বিষয়গুলো হালাল ও হারাম উভয় কাজেই ব্যবহৃত হতে পারে সেগুলো হারাম হয়ে যাবে যেহেতু সম্ভাবনা রয়েছে তা হারাম পথে ব্যবহৃত হওয়ার। যেমন কেউ চাকু বা রেডিও অন্যায় পথে ব্যবহার করতে পারে এই অজুহাত দেখিয়ে আমরা চাকু ও রেডিও বিক্রয় হারাম ঘোষণা করি তবে তা কখনোই যুক্তিযুক্ত হবে না। তাই এরূপ লেনদেনকে কেউই হারাম বা

বাতিল বলে ঘোষণা করেন নি। তবে কেউ যদি এই অন্যায় নিয়তে তা বিক্রয় করে তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

আল্লাহর ওলীদের কবরের পাশে মসজিদ নির্মাণ এবং তা আলোকিত করা

(মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালানো)

আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট মসজিদ নির্মাণ, নামায পড়া, দোয়া করা এবং তাদের কবর জিয়ারত করাকে যেমন হারাম মনে করে তেমনি কবরের সৌন্দর্য বর্ধন ও সেখানে আলোক সজ্জা করাকেও সর্বোতভাবে হারাম মনে করে যদিও তা রাসূল (সা.) ও তাঁর বংশধর ইমামদের কবর হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য মুসলমানগণ উপরিউক্ত কর্মগুলোকে জায়েয মনে করে। তারা তাদের এ কর্মের সমর্থনে কিয়াসের সার্বিক ও সর্বজনীনতার নীতির [২৪৬] ভিত্তিতে বলে যেহেতু রাসূল (সা.), সাহাবিগণ, তাবেয়ীনসহ সকল মুসলমান ইসলামের ইতিহাসের সকল পর্যায়ে কাবাঘরের (কাবাগৃহের) প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে তা মূল্যবান বস্ত্রে সজ্জিত ও তাকে রাত্রিতে আলোকিত রাখাকে জায়েয বলেছেন ও কার্যত তা সজ্জিত ও অলংকৃত রাখার বিষয়ে তৎপর থেকেছেন। অনুরূপ কারণে আল্লাহর ওলীদের কবরের সৌন্দর্য বর্ধন ও তাতে আলোকসজ্জা করাতে কোন অসুবিধা নেই, কারণ কাবাগৃহ আল্লাহর গৃহ হিসেবে যে বিশেষত্ব রাখে আল্লাহর ওলিগণও একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যদি কাবাগৃহে শিরক ও মূর্তিপূজার সম্ভাবনা সত্ত্বেও এ কর্ম বৈধ হয়ে থাকে, আল্লাহর ওলীদের কবরও অনুরূপ সম্ভাবনা সত্ত্বেও সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে সজ্জিত করা বৈধ বলে পরিগণিত হবে। যখন আমরা এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী কোন দলিল প্রমাণ উপস্থাপিত হতে দেখি না।

আল্লাহর ওলীদের কবরের সৌন্দর্য বর্ধন ও আলোকিত করা হারাম হওয়ার সপক্ষে ওয়াহাবীদের দলিল

নাসায়ী নিজস্ব সনদে (সূত্রে) ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ সে সকল নারীর উপর অভিশম্পাত বর্ষণ করুন যারা কবর জিয়ারত করে, আর তাদের উপর অভিশম্পাত করুন যারা কবরকে মসজিদ বানায় ও সেখানে আলো (প্রদীপ) জ্বালায়।’

আমাদের উত্তর হলো : উল্লিখিত হাদীসটি সনদ ও দালালাতের দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ এবং সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর ওলীদের কবরে আলো জ্বালানোর নিষিদ্ধতার প্রমাণ তাতে নেই। কারণ

১। হাদীসটির সনদ বা সূত্রগত সমস্যা : বিশিষ্ট ওয়াহাবী হাদীসবিদ নাসিরউদ্দীন আলবানী ইবনে আব্বাসের হাদীসটি উল্লেখের পর বলেছেন, 'এ হাদীসটি আবু দাউদ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন কিন্তু সনদের দিক থেকে তা দুর্বল (অর্থাৎ তাতে কয়েকজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন)। যদিও পূর্ববর্তী আলেমদের অনেকেই উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে কথা বলেছেন কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই সত্যকে বলতে হবে ও তার অনুসরণ করতে হবে।'

এ হাদীসটিকে যারা দুর্বল বলেছেন তাদের মধ্যে মুসলিমও রয়েছেন। তিনি তার 'আত তাফসীল' গ্রন্থে বলেছেন : হাদীসটি নির্ভরযোগ্য নয়। যেহেতু হাদীসটির সনদে আবু সালিহ বাজাম রয়েছে, হাদীসবিদগণ তা গ্রহণে আপত্তি করেছেন। ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনাকারী রাবীর ব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে যে ইবনে আব্বাস হতে এ হাদীসটি শুনেছে কিনা বা শুনার সম্ভাবনা ছিল কিনা?

অতঃপর তিনি বলেছেন : উক্ত হাদীসটি যে দুর্বল আমি আমার 'আল আহাদিসুজ জায়িফা ওয়াল মাওজুয়া ও আসারু হাস সাইয়ি ফিল উম্মাহ' গ্রন্থে তা প্রমাণ করেছি। হাদীস শাস্ত্রবিদদের কেউই আবু সালিহ বাজামের বর্ণিত হাদীসসমূহ হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেন না। কারণ তাদের নিকট সে দুর্বল বর্ণনাকারী এবং কেউই তাকে বিশ্বস্ত বা নির্ভরযোগ্য বলেন নি। তবে ইবনে হাব্বান ও আজলী তাকে নির্ভরযোগ্য বললেও তারা উভয়েই অতি উদারতার দোষে দুষ্ট। অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত কোন সমর্থক হাদীসও আমরা এক্ষেত্রে পাই না যার মাধ্যমে উল্লিখিত হাদীসটির দুর্বলতাকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি।[২৪৭]

২। দালালাতের পর্যালোচনা :

ক) উল্লিখিত হাদীসটির লক্ষ্য নবী ও আল্লাহর ওলীদের কবর নয়, কারণ তাঁদের কবরসমূহকে অবশ্যই বিভিন্নভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রদীপ জ্বালানো ও আলোকসজ্জার মাধ্যমে তাদের কবরকে সম্মান দেখানো এর অন্যতম পদ্ধতি।

খ) যেহেতু নবী ও ওলীদের কবর ব্যতীত অন্যান্যদের কবরের ক্ষেত্রে অযথা অর্থ অপচয় ঘটে সেহেতু ঐরূপ ক্ষেত্রেই হাদীসটি প্রযোজ্য। কিন্তু আল্লাহর ওলীদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে তার নিকট প্রদীপ জ্বালানো, সেখানে কোরআন তেলাওয়াত করা, দোয়া ও নামায পড়া প্রভৃতির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কবর জিয়ারতকারীকে আত্মিক ও নৈতিক কল্যাণ অর্জনে সাহায্য করার কারণে এ ক্ষেত্রে তা হারাম বা মাকরূহ নয়, বরং মুস্তাহাব। কারণ তা সৎকাজে সহযোগিতার শামিল ও পরহেজগারীর নিকটবর্তী।

আজিজী হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'হাদীসটি ঐ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন আলো জ্বালানো হতে জীবিতরা কল্যাণ পায় না। কিন্তু যদি তা হতে কল্যাণ অর্জন করা যায় সেক্ষেত্রে অসুবিধা নেই।'[২৪৮]

সিন্দী সুনানে নাসায়ীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেন, 'কবরের নিকট প্রদীপ ও আলো জ্বালাতে এজন্যই নিষেধ করা হয়েছে যে, তা অর্থের অপচয় ও কোন কল্যাণই তা থেকে লাভ করা যায় না। যদি কোন ক্ষেত্রে লাভ পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার বিধান থাকবে না।'[২৪৯]

শেখ আলী নাসেফ বলেছেন, 'কবরের নিকট আলো জ্বালানো বৈধ (জায়েয) নয়। কারণ এটি অর্থের অপচয়। কিন্তু যদি কোন জীবিত ব্যক্তি কবরের নিকট উপস্থিত থাকে সেক্ষেত্রে আলো জ্বালিয়ে রাখাতে কোন অসুবিধা নেই।'[২৫০]

গ) হাদীসটিকে হারাম অর্থে না নিয়ে মাকরূহ অর্থেও নেয়া সম্ভব।

ঘ) মুসলমানদের চিরাচরিত রীতি ছিল এটি যে, তারা মৃত ব্যক্তিদের বিশেষত আল্লাহর ওলী ও বিশেষ ব্যক্তিদের কবরের নিকট আলো জ্বালিয়ে রাখতেন খতিব বাগদাদী স্বীয় সূত্রে ফিলিস্তিনী এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তুরস্কের কন ।টিনোপলে একটি দেয়ালের পাদদেশে প্রজ্বলিত প্রদীপ দেখে প্রশ্ন করেন : কবরটি কার? এলাকাবাসী জবাব দেয় তা রাসূলের বিশিষ্ট সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারীর। কবরের নিকটবর্তী হয়ে দেখতে পান কবরের উপর ছাদ হতে শিকলের সাহায্যে বাতি ঝুলানো রয়েছে।[২৫১]

ইবনে জাওযী বলেছেন, ৩৮৬ হিজরী সালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল বসরার লোকেরা দাবী করেছিল যে, একটি পুরাতন কবরের সন্ধান পেয়েছে যা জুবাইর ইবনে আওয়ামের কবর বলে জানা যায়। তখন চাটাই, প্রদীপ ও অন্যান্য সরঞ্জাম এনে তা পরিপাটি ও সজ্জিত করা হয় এবং সে স্থানের যত্ন নেয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করা হয়। ঐ স্থানটিও ওয়া ফ করে দেয়া হয়। [২৫২]

সাফাদী ইমাম মূসা কাজিম (আ.)- এর কবর সম্পর্কে বলেছেন, ‘তাঁর কবর ঐ স্থানে (বাগদাদের নিকটবর্তী কাজেমাইনে) প্রসিদ্ধ এবং লোকজন সেখানে জিয়ারতের জন্য যায়। তার উপর গম্বুজ নির্মিত হয়েছে যাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত আচ্ছাদনসহ প্রদীপসমূহ প্রজ্বলিত ছিল। বিভিন্ন ধরনের কার্পেট সেখানে দৃশ্যমান ছিল।[২৫৩]

ঙ) ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হাদীসটির বিপরীত হাদীসসমূহ আমাদের হাতে রয়েছে যেমন মহানবী (সা.) রাত্রিতে জান্নাতুল বাকীতে যেতেন ও তাঁর সঙ্গে এক ব্যক্তি কবরের নিকট হাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।[২৫৪]

শাফায়াত

সকল ধর্মবিশ্বাসী, বিশেষত সাধারণভাবে সকল মুসলমানই শাফায়াতে বিশ্বাসী অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর ওলিগণ একদল গুনাহ্‌গার বান্দার জন্য সুপারিশ ও ক্ষমা প্রার্থনা (শাফায়াত) করবেন এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে দোযখের আগুন হতে মুক্তি দিবেন। আবার কারো কারো মতে শাফায়াতের অর্থ আল্লাহর ওলিগণ সুপারিশের মাধ্যমে ব্যক্তির মর্যাদা ও অবস্থানের উত্তরণ ঘটাবেন। কিন্তু এই সুপারিশের বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণ নিয়ে ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন ইহুদীরা তাদের ওলী ও নবীদের ক্ষেত্রে শর্তহীন সুপারিশের অধিকারে বিশ্বাসী। কোরআন এ বিশ্বাসকে সুস্পষ্টভাবে ভিত্তিহীন বলে ঘোষণা করেছে। মুসলমানদের মধ্যে ওয়াহাবীরা বিশ্বাস করে শুধু আল্লাহর নিকট শাফায়াত কামনা করা জায়েয, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট শাফায়াত কামনা করা শিরক বলে গণ্য। কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমানরা বিশ্বাস করেন শাফায়াতের (আল্লাহর নিকট সুপারিশ ও ক্ষমা প্রার্থনা) অধিকার আল্লাহ্ তাঁর কোন কোন বিশেষ বান্দাকে দিয়েছেন এবং মুসলমানরা সরাসরি তাঁদের নিকট শাফায়াতের আবেদন করতে পারে। তবে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সুপারিশ গ্রহণের ও ক্ষমা করার অধিকার প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর এবং তাঁর ওলিগণ তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে এই শাফায়াত করবেন অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁরা স্বাধীন নন; বরং আল্লাহর ইচ্ছার অনুবর্তী। আমরা এখানে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

মুসলিম উম্মাহর মতৈক্য

ইসলামী উম্মাহর আলেমগণ শাফায়াতের বৈধতা এবং মহানবী (সা.) যে কিয়ামতের দিন শাফায়াতকারীদের অন্যতম এ বিষয়ে একমত, যদিও তাঁদের মধ্যে শাফায়াতের শাখাগত কোন

কোন বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। প্রথমে আমরা শিয়া ও সুন্নী উভয় মাজহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে শাফায়াতের বিষয়টি আলোচনা করব।

১। আবু মনসুর মাতেরিদী[২৫৫] (মৃত্যু ৩৩৩ হিজরী) পবিত্র কোরআনের সূরা আম্বিয়ার ২৮ নং আয়াত :

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾

"*তারা যার প্রতি তিনি (আল্লাহ্) সন্তুষ্ট তার জন্য ব্যতীত অন্য কারো জন্য শাফায়াত করবে না*" - এর তাফসীরে বলেছেন, এ আয়াতটি ইসলামে শাফায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি সমর্থন করে। [২৫৬] ২। তাজুদ্দীন আবু বকর কালাবাজী (মৃত্যু ৩৮০ হি.) বলেছেন, 'আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে যে, মহান আল্লাহ শাফায়াতের বিষয়ে যা কিছু বলেছেন এবং হাদীসসমূহে এ সম্পর্কে যা এসেছে তার সবকিছু বিশ্বাস করা ওয়াজিব।'[২৫৭]

৩। শেখ মুফিদ (৩৩৬- ৪১৩ হি.) বলেছেন, 'ইমামীয়া শিয়ারা এ বিষয়ে একমত যে, মহানবী (সা.) কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মতের একদল গুনাহগার বান্দার জন্য শাফায়াত করবেন। তেমনি আমীরুল মুমিনীন (আ.) ও তাঁর বংশধারার পবিত্র ইমামগণ তাঁদের অনুসারীদের মধ্য হতে অনেক গুনাহগার বান্দার জন্য সুপারিশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং মহান আল্লাহ তাঁদের শাফায়াতের কারণে অনেক গুনাহগার বান্দাকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দিবেন।'[২৫৮]

৪। শেখ তূসী (৩৮৫- ৪৬০ হি.) বলেছেন, 'শিয়ারা বিশ্বাস করে রাসূল (সা.), তাঁর অনেক সাহাবী, তাঁর বংশের ইমামগণ এবং মুমিন বান্দাদের অনেকেই শাফায়াত করবেন।'[২৫৯]

৫। আবু হাফস নাসাফী (মৃত্যু ৫৩৮ হি.) বলেছেন, 'আল্লাহর নবিগণ মুসলিম উম্মাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য শাফায়াত করার অধিকার রয়েছে যা প্রমাণিত সত্য।'[২৬০]

৬। তাফতাজানী নাসাফীর মতের পর্যালোচনা করতে গিয়ে নির্দ্বিধায় তার মতকে সমর্থন করেছেন।[২৬১]

৭। কাজী আয়াজ ইবনে মূসা (জন্ম ৫৪৪ হি.) বলেছেন, 'আহলে সুন্নাত বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে শাফায়াতকে স্বীকার করে এবং পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ এবং হাদীস তা ঘটবে বলে সাক্ষ্য প্রদান ও সত্যায়ন করে।'[২৬২]

৮।

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾

আয়াতটির তাফসীরে কাজী বাইদ্বাভী বলেছেন, 'অনেকেই এ আয়াতটিকে কবীরা গুনাহকারীদের জন্য শাফায়াতের বিপক্ষে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে, আয়াতটি কাফেরদের সম্পর্কিত। কারণ পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ ও অসংখ্য রেওয়ায়েত রাসূলের উম্মতের জন্য শাফায়াতের বিষয়টি সত্যায়ন করেছে।'[২৬৩]

৯। ফাততাল নিশাবুরী বলেছেন, 'মুসলমানদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতৈক্য নেই যে, শাফায়াতের বিষয়টি সর্বসিদ্ধ এবং এর ফলশ্রুতিতে গুনাহগার মুমিনদের হতে শাস্তি দূরীভূত হবে।'[২৬৪]

১০। ইবনে তাইমিয়া হাররানী (জন্ম ৭২৮ হি.) বলেছেন, 'মহানবীর জন্য কিয়ামতের দিন তিন ধরনের শাফায়াত রয়েছে... তৃতীয় প্রকারটি হলো জাহান্নামীদের জন্য।'[২৬৫]

১১। নিজামুদ্দীন কুশচী (জন্ম ৮৭৯ হি.) বলেছেন, ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ আয়াতটির[২৬৬] ভিত্তিতে মুসলমানগণ শাফায়াত অবধারিত হওয়ার ঐকমত্য পোষণ করে।

১২। শারানী হানাফী বলেছেন, 'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী হবেন।'[২৬৭]

১৩। আল্লামা মাজলিসী (জন্ম ১১১০ হি.) বলেছেন, 'শাফায়াতের বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য নেই। কারণ বিষয়টি ইসলামের অনস্বীকার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত এ অর্থে যে, মহানবী (সা.) কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মাতের জন্য এমনকি পূর্ববর্তী নবিগণের উম্মতদের জন্যও শাফায়াত করবেন।'[২৬৮]

১৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব (১১১৫- ১২০৬ হি.) বলেছেন, ‘রাসূল (সা.), পূর্ববর্তী নবিগণ, ফেরেশতামণ্ডলী, ওলিগণ ও নিষ্পাপ শিশুদের শাফায়াতের অধিকার রয়েছে এ বিষয়টি বর্ণিত সকল হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত সত্য।’[২৬৯]

পবিত্র কোরআনে শাফায়াত

কোরআনের শাফায়াত সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

১। যে সকল আয়াত শাফায়াতকে প্রত্যাখ্যান করে :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে যে জীবিকা দেয়া হয়েছে তা হতে ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয় বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও শাফায়াত নেই এবং কাফেররা বুঝতে পারবে তারাই জুলুমকারী ছিল।” (সূরা বাকারা : ২৫৪)

কিন্তু অন্যত্র কোরআনে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে শাফায়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং উক্ত আয়াতটিতে যে শাফায়াত আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সংঘটিত হবে তাকেই অস্বীকার করা হয়েছে।

২। ইহুদীদের বিশ্বাসের শাফায়াতকে বাতিল ঘোষণা :

﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾

“হে বনি ইসরাঈল (ইসরাঈলের সন্তানগণ)! তোমাদের উপর যে নিয়ামত দিয়েছি তা স্মরণ কর। এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলাম। সেদিনকে ভয় কর (সেদিন হতে নিজেকে রক্ষা কর) যেদিন একজনকে অপরের জন্য শাস্তি দেয়া হবে না এবং কারো শাফায়াত (সুপারিশ) গ্রহণ করা হবে না। কোন বিনিময় গৃহীত হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।” [২৭০]

এ আয়াতে কোরআন বিশেষ ধরনের শাফায়াতকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ ইহুদীরা যে শর্তহীন শাফায়াতে বিশ্বাসী ছিল তা এ আয়াতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ এ ধরনের

শাফায়াতের ক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজন নেই ধারণা করা হয়েছে এবং শাফায়াতকারী ও যার জন্য শাফায়াত করা হবে উভয়ের জন্যই কোন শর্ত আরোপ করা হয় নি।

৩। কাফেরদের জন্য শাফায়াতকে প্রত্যাখ্যান :

﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾

"(কাফেররা বলবে) আমরা প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম। এমতাবস্থায় (মৃত্যুর মাধ্যমে) কিয়ামতের বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করলাম। সেদিন শাফায়াতকারীদের শাফায়াত তাদের কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না।" [২৭১]

৪। মূর্তিদের শাফায়াতের অধিকার প্রত্যাখ্যান

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

"তারা (মুশরিকরা) আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের কোন অকল্যাণ ও কল্যাণই করতে পারে ন। তারা বলে এই মূর্তিগুলো আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফায়াতকারী, তাদেরকে বল তোমরা কি আল্লাহকে এমন এমন বিষয়ে জানাতে চাও আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যে বিষয়ে তিনি অবহিত নন। তোমরা যাকে তাঁর শরীক কর তিনি তা হতে পবিত্র ও উর্ধ্বে।" [২৭২]

৫। শাফায়াত কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট :

﴿قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"শাফায়াত আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি। অতঃপর তোমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।" [২৭৩]

৬। শাফায়াত আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের জন্য শর্তাধীন :

﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ﴾

"তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন শাফায়াতকারী নেই।" [২৭৪]

﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾

“কারো জন্য তার নিকট শাফায়াত তাঁর নিকট ফলপ্রসূ হবে না সেই ব্যক্তির জন্য ব্যতীত যাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।” [২৭৫]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহকে সমন্বিত করে নিম্নোক্ত ফল পাওয়া যায় : যেহেতু কর্মের ক্ষেত্রে একত্ববাদের নীতির (তাওহীদে আফআলী) ভিত্তিতে বিশ্বে সকল কর্মের প্রকৃত প্রভাবক ও কর্তা হলেন... এবং কোন কর্মই তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না সেহেতু কোন কোন আয়াতে শাফায়াতকে নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টির সঙ্গে যে সকল আয়াতে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে অন্যদের শাফায়াতের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ তিনিই তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষ শর্তাধীনে অন্যদের তা করার অধিকার দিয়েছেন যেমন নবী ও তাঁর ওলীদের এমনটি দিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনে শাফায়াত

কয়েকটি কারণে মানব জাতির জন্য শাফায়াতের অপরিহার্যতা দেখা দেয়।

১। মানব জাতির গুনাহে পতিত হওয়া : কেউ কেউ বলেন, 'কিয়ামত দিবসে মানুষের একমাত্র মুক্তির উপকরণ হলো সৎকর্ম'। যেমন পবিত্র কোরআনে এসেছে :

﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ﴾

"এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে তার জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে।" [২৭৬]

যদিও সাফল্য, সৌভাগ্য ও প্রতিদান লাভের বিষয়টি সৎকর্মের উপর অনেকটাই নির্ভর করে, কিন্তু অন্যান্য আয়াত হতে বোঝা যায়, শুধু সৎকর্মের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় যদি না মহান আল্লাহর অপরিসীম রহমত তার সঙ্গে যুক্ত না হয়। যেমন,

﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত তোমাদের উপর না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে।" [২৭৭]

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ﴾

"যদি আল্লাহ মানব জাতিকে তাদের অন্যায়ের জন্য ধরতেন তবে পৃথিবীর উপর বিচরণশীল কোন প্রাণীকেই ছাড়তেন না।" [২৭৮]

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ﴾

"যদি আল্লাহ মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন তবে ভূপৃষ্ঠের উপর চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না।" [২৭৯]

২। আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা :

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾

অর্থাৎ "হে আমাদের পালনকর্তা! আপনার রহমত ও জ্ঞান সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।" [২৮০]

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ

"যদি তারা তোমার প্রতিপালককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে বল তোমাদের প্রভু অসীম রহমতের অধিকারী।" [২৮১]

শাফায়াত আল্লাহর ওলীদের রহমতের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

৩। মানুষের অন্যতম মৌল আকাঙ্ক্ষা হলো মুক্তি। বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে এটি প্রমাণিত যে, মানুষের অন্যতম মৌল আকাঙ্ক্ষা হলো পৃথিবী ও আখেরাতের শাস্তি হতে মুক্তি লাভ। যেহেতু মানুষের অন্যতম অভ্যন্তরীণ মৌল দিক এটি, সেহেতু মৃত্যুর পর বারজাখ (কবরের জীবন) হতে শুরু করে কিয়ামতের দিবস ও জাহান্নামে (সীমিত সময়ের জন্য) শাস্তি দানের মাধ্যমে তাকে পবিত্র করে তার সত্তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যই শাফায়াত।

শাফায়াতের প্রভাব

শাফায়াতের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে

(১) শাফায়াত গুনাহকে মুছে দেয় ও শাস্তিকে লাঘব করে; (২) শাফায়াতের মাধ্যমে পুণ্য বৃদ্ধি পায় ও মর্যাদার উত্তরণ ঘটে। অধিকাংশ মুসলমান প্রথম অর্থে শাফায়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু মুতাজিলাগণ দ্বিতীয় অর্থকে স্বীকার করে ও প্রথম অর্থকে গ্রহণযোগ্য মনে করে না। আমাদের মতে প্রথম অর্থ অধিকতর উপযুক্ত। এ যুক্তিতে :

১। শাফায়াতের বিষয়টি ইসলাম পূর্ব ইহুদী ও মুশরিকদের বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম শাফায়াতের বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার মূলক বিশ্বাসসমূহকে পরিশুদ্ধ করে সঠিক ধারণাটি ইসলামী সমাজে উপস্থাপন করেন। ইসলাম পূর্ব ইহুদী ও মুশরিকদের শাফায়াত সম্পর্কিত বিশ্বাসের বিষয়ে যাদের ধারণা রয়েছে তারা জানেন যে, তারা যে ধরনের শাফায়াতে বিশ্বাসী ছিল এবং তাদের নবীদের ও পূর্ব পুরুষদের অধিকার বলে জানত, তা তাদের গুনাহসমূহের ক্ষমার জন্যই ছিল। কিন্তু তাদের এ বিশ্বাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যা ছিল তা হলো তারা শাফায়াতের অধিকারকে শর্তহীন মনে করত। তাই ইসলাম শাফায়াতের প্রতি বিশ্বাসকে আল্লাহর অনুমতির শর্তাধীন বলে ঘোষণা করে বলে:

﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

"কে আছে এমন যে সুপারিশ রবে তাঁর নিকট তাঁর অনুমতি ছাড়াক (শাফায়াত)" [২৮২] এবং

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾

"যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট তার জন্য ব্যতীত অন্য কারো জন্য শাফায়াতকারীরা শাফায়াত করতে পারে না।" (সূরা আম্বিয়া : ২৮)

২। শিয়া ও সুন্নী উভয়সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ শাফায়াতের সর্বজনীনতার প্রতিই ইঙ্গিত করে, যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন :

اذّخرتُ شفاعتی لأهل الکبائر من امّتی

'আমার সুপারিশকে আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য সঞ্চিত রেখেছি।'[২৮৩]

৩। কোন কোন আয়াতের ইশারা হতে বোঝা যায় আল্লাহ কোন কোন ক্ষেত্রে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীতই গুনাহকে ক্ষমা করেন। এই সকল আয়াত গুনাহ মোচনের সাথেই অধিক সংগতিশীল। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾

"*তিনি আল্লাহ বান্দাদের তওবাকে গ্রহণ করেন ও গুনাহসমূহকে ক্ষমা করেন।*" [২৮৪]

শাফায়াতকারীদের হতে শাফায়াতের আবেদন

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি অনেক গুনাহকারীকে আল্লাহ শাফায়াতের মাধ্যমে ক্ষমা করেন। পবিত্র কোরআন শাফায়াতের বিষয়টি নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়ে তা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে হবে বলে ঘোষণা করেছে।

﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

“কে আছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে।” [২৮৫]

অন্যত্র বলেছেন :

﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ﴾

“কোন সুপারিশকারীই তাঁর অনুমতির পূর্বে সুপারিশ করতে পারে না।” [২৮৬]

অন্যদিকে শাফায়াতের বিষয়ে মূর্তিপূজকদের বিশ্বাসকে এ কারণে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে যে, তারা এমন বস্তুকে সুপারিশকারী বলে গ্রহণ করেছে যার কল্যাণ ও অকল্যাণের ক্ষমতা নেই ও আল্লাহর পক্ষ হতে সুপারিশের কোন অধিকারও নেই। তাই বলা হয়েছে :

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

“(এই অজ্ঞ ব্যক্তিরা) আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের কোন অকল্যাণ ও কল্যাণই করতে পারে না এবং তারা বলে এই মূর্তিগুলো আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী। বলুন, (হে নবী!) তোমরা কি আল্লাহকে এমন এমন বিষয়ে খবর দিতে চাও আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যে বিষয়ে তিনি অবহিত নন। তোমরা তাঁর সঙ্গে যাকে শরীক কর তিনি তা হতে পবিত্র ও উর্ধ্বে। ” [২৮৭]

সুতরাং যে আয়াতটি মুশরিকদের মূর্তিকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে শাফায়াতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারের পক্ষে দলিল হিসাবে উপস্থাপন সুস্পষ্ট অপযুক্তি। কারণ ইসলামে সুপারিশকারীর উপাস্য হওয়া ও শর্তহীন সুপারিশের বিষয়গুলো আদৌ নেই। পবিত্র কোরআন ফেরেশতা মণ্ডলীকে সুপারিশকারী হিসেবে ঘোষণা করে বলেছে, তারা যার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে তার জন্য ব্যতীত সুপারিশ করে না।

﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ﴾

“বরং তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা, তারা কখনোই আল্লাহর নির্দেশের অগ্রগামী হয় না এবং তাঁর নির্দেশেই কাজ করে। তিনি (আল্লাহ) তাদের অগ্র ও পশ্চাতে যা আছে সে সম্পর্কে অবহিত। তারা তাদের জন্যই শাফায়াত করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।” [২৮৮]

সুতরাং মহানবী (সা.) ও অন্যান্যদের জন্য কিয়ামতের দিন শাফায়াতের বিষয়টি স্বীকৃত অর্থাৎ তাঁদের সুপারিশের অধিকার রয়েছে তখন মুমিনদের জন্য তাঁদের নিকট সুপারিশ কামনা বৈধ ও জায়েয হবে, যেমন দোয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে।

শাফায়াতকারীদের নিকট শাফায়াতের বিষয়ে ওয়াহাবীদের মত

ওয়াহাবিগণ যদিও শাফায়াতের বিষয়টিকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু শাফায়াতের বিধান ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা অন্যান্য মুসলমানদের শাফায়াত সম্পর্কিত বিশ্বাসকে শিরকমিশ্রিত মনে করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য তা হলো শাফায়াতকারীদের নিকট শাফায়াত কামনা করা সম্পর্কিত। মুসলমানদের সকল মাজহাবের নিকট শাফায়াতের অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে শাফায়াত কামনা তাঁর জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় জায়েয। কিন্তু ওয়াহাবীদের মতে এরূপ বিশ্বাস শিরকের শামিল। তারা বিশ্বাস করে শাফায়াত কামনার সঠিক পন্থা হলো বান্দা সরাসরি আল্লাহর নিকট চাইবে তাঁর রাসূল (সা.) অথবা শাফায়াতের অধিকারী বান্দা যেন তার জন্য সুপারিশ করে।

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, 'যদি কেউ বলে যে, যেহেতু রাসূল (সা.) আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত সেহেতু আমি তাঁর নিকট চাই তিনি যেন এ বিষয়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করেন', তবে তার কাজটি মুশরিকদের অনুরূপ বলে গণ্য হবে।'[২৮৯]

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব বলেছেন, 'একমাত্র আল্লাহর নিকট শাফায়াত চাইতে হবে, কোন শাফায়াতকারীর নিকট নয়। অর্থাৎ এভাবে বলতে হবে যে, হে আল্লাহ! রাসূল (সা.)-কে কিয়ামতের দিন আমার জন্য শাফায়াতকারী করুন।'[২৯০]

ওয়াহাবীদের যুক্তিসমূহ

ওয়াহাবীরা তাদের দাবীর সপক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করেছে :

১। শাফায়াতের জন্য কোন শাফায়াতকারীকে আহ্বান করা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকার শামিল এবং এটি ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক বলে পরিগণিত। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"*তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে আহ্বান করো না।*" (সূরা জ্বিন: ১৮)

আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুকে ডাকা সার্বিকভাবে হারাম নয় এবং তার অবধারিত পরিণতি শিরকে পতিত হওয়া নয়। কারণ যদি কোন ব্যক্তির জন্য কোন কাজ করা বৈধ ও শরীয়তসম্মত হয়, তবে তার নিকট ঐ কাজ করার আহ্বান জানানোও বৈধ ও জায়েয হবে। যদি মহানবী (সা.) ও আল্লাহর অন্যান্য ওলীদের কিয়ামতের দিন শাফায়াতের অধিকার থাকে, তবে তাঁদের নিকট শাফায়াত করার আবেদন জানানোও শরীয়তসম্মত হবে। প্রকৃতপক্ষে শাফায়াত হলো শাফায়াতের যোগ্য ব্যক্তির জন্য শাফায়াতের অধিকারী ব্যক্তির দোয়া ও আল্লাহর নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। সুতরাং যেমনভাবে প্রত্যেক মুমিনই তার যে কোন মুমিন ভাইয়ের নিকট দোয়া চাইতে পারে- যা ওয়াহাবীরাও বিশ্বাস করে- তেমনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (দোয়া করার ও শাফায়াতের অধিকারী) ব্যক্তির নিকট শাফায়াত কামনা করাও জায়েয। তবে শাফায়াত ও কামনা ঐ সকল ব্যক্তির নিকট করতে হবে যাঁদের আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফায়াত করার অধিকার রয়েছে, যেমন নবী, ফেরেশতা, ওলী ও পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ।

তিরমিযী আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূল (সা.)- এর নিকট কিয়ামতের দিন শাফায়াতের আহ্বান জানান।[২৯১]

হযরত ইয়াকুব (আ.)- এর সন্তানরা তাদের পিতার নিকট তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন,

﴿يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾

“(তারা বলল) হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আমরা ভুল করেছি। ” [২৯২]

অন্যত্র আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন তাদের গুনাহসমূহের ক্ষমার জন্য মহানবীর শরণাপন্ন হতে, যাতে তিনি তাদের জন্য ক্ষমা চান,

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾

“যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তোমার নিকট আসত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও দয়ালু হিসেবে পেত।” [২৯৩]

যদি ওয়াহাবীরা আল্লাহর রাসূলের নিকট চাওয়াকে তাঁর মৃত্যুর পর শিরক মনে করে, তবে আমরা বলব, যেহেতু তাদের মতে আল্লাহ ভিন্ন কাউকে আহ্বান করা সর্বতোভাবে হারাম ও শিরক, সেহেতু তাঁর জীবদ্দশায়ও তা হারাম ও শিরক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে প্রমাণিত সত্য যে, রাসূলের দৈহিক মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাঁর আত্মা জীবিত এবং দোয়া, শাফায়াত কামনা প্রভৃতি সকল কিছু শ্রবণ রুহ ও আত্মার সাথে সম্পর্কিত, দেহের সাথে নয়। আমরা বারজাখী জীবনের আলোচনায় এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২। কোরআনের সাক্ষ্য অনুযায়ী মহান আল্লাহ রাসূলের সময়সাময়িক যুগের মূর্তিপূজকদের এ কারণে মুশরিক বলেছে যে, তারা খোদা ভিন্ন অন্য কিছুর শাফায়াত কামনা করত।

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ﴾

“তারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনা করত যা তাদের কোন অকল্যাণ ও কল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না এবং বলত এগুলোই আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী।” [২৯৪]

আমাদের জবাব

রাসূলের যুগের মুশরিকগণ তাদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে তাদের শাফায়াতকারী মনে করত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আয়াতটিতে এটিও বলা হয়েছে যে, তারা ঐ মূর্তিগুলোর উপাসনা করত। যেহেতু তারা তাদের ইবাদত করত ও একই সাথে তাদেরকে শাফায়াতকারী মনে করত সেহেতু আল্লাহ তাদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন।

উপরন্তু তারা এমন কিছুর জন্য শর্তহীন সুপারিশের অধিকারে বিশ্বাসী ছিল যে, যাদের সুপারিশের কোন অধিকারই আল্লাহ দেন নি। এ বিষয়গুলোই তাদের শাফায়াতের বিশ্বাসকে শিরকমিশ্রিত করেছে। কিন্তু যদি কেউ এমন কোন ব্যক্তির জন্য শাফায়াতের অধিকার রয়েছে বলে

বিশ্বাস করে যাঁকে স্বয়ং আল্লাহ এমন অধিকার দিয়েছেন এবং এ শাফায়াত তিনি আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষেই করেন বলে জানে, পরিশেষে এ শাফায়াতের বিশ্বাস শাফায়াতকারীর উপাস্য হওয়াতে পর্যবসিত হয় না, তবে তা কোন অবস্থাতেই হারাম হতে পারে না। অর্থাৎ যদি কেউ শাফায়াতকারীকে উপাস্য মনে না করে এবং এর অধিকারী আল্লাহর অনুমতিপ্রাপ্তদের মধ্য হতে হয় তবে তা হারাম হবে না।

৩। পবিত্র কোরআনে শাফায়াতকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট বলেছে :

﴿قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾

“*বলুন সকল সুপারিশ আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।*” (সূরা যুমার: ১৮)

উল্লিখিত আয়াত হতে বোঝা যায় শাফায়াত শুধু আল্লাহর নিকট চাইতে হবে।

আমাদের জবাব

শাফায়াত যেহেতু মানুষের ভাগ্যের উপর প্রভাবশীল একটি বিষয় এবং মহান আল্লাহর প্রতিপালক গুণের একটি প্রকাশ সেহেতু সত্তা ও উৎপত্তিগত দৃষ্টিতে তা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু এ বিষয়টি তাঁর নবিগণ ও সৎকর্মশীল বান্দাদের শাফায়াতের অধিকারের সঙ্গে অসংগতিশীল নয়। কারণ তাঁরা স্বাধীনভাবে শাফায়াতের অধিকার রাখেন না, বরং আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে ও অনুমতি সাপেক্ষে শাফায়াত করেন। এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছে

﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

“*কে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে।*” এবং

﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾

“*তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন শাফায়াতকারী থাকবে না।*” অর্থাৎ তাঁর অনুমতির পরই কেউ শাফায়াত করতে পারবে।

৪। যদিও শাফায়াত কামনা দোয়ার শামিল, কিন্তু মৃত ব্যক্তির নিকট তা কামনা করা বৃথা। কারণ মৃত ব্যক্তি কবরে কিছু শোনে না, কারণ তার জীবন নেই।

উত্তর : আমরা ‘মৃত্যু পরবর্তী কবরের জীবনে’র আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং প্রমাণ করেছি কবরে মানুষের জীবন রয়েছে। ‘মৃতরা শুনতে পায় না’- এ সম্পর্কিত ওয়াহাবীদের উপস্থাপিত আয়াতসমূহের সঠিক ব্যাখ্যাও আমরা উপস্থাপন করেছি।

শাফায়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের যুক্তিসমূহের পর্যালোচনা

১। শাফায়াত গুনাহর প্রতি উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, কারো কারো মতে শাফায়াতের প্রতি বিশ্বাস গুনাহ করার সাহস যোগায় এবং অন্যায়কারীদের ঔদ্ধত্যকে বাড়িয়ে দেয়। তাই তা ইসলামী শরীয়তের প্রাণের সাথে সংগতিশীল নয়।

পর্যালোচনা

প্রথমত যদি এমনটিই হয়ে থাকে, তবে ‘তওবা করার সুযোগ দান ও ক্ষমার সুসংবাদও মানুষকে গুনাহ করতে উদ্বুদ্ধ করার কথা ও গুনাহের উদ্দীপক বলে গণ্য হবে। অথচ তওবা হলো ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত এবং সকল মুসলমান এ বিষয়ে একমত।

দ্বিতীয়ত প্রতিশ্রুত শাফায়াতের বিষয়টি তখনই মানুষের মধ্যে ঔদ্ধত্য সৃষ্টি করবে যখন সকল ধরনের অপরাধী ও যে কোন চরম মন্দ কোন বৈশিষ্ট্যের ও যে কোন ধরনের শাস্তিও উপযুক্ত তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে. কিন্তু যখন শাফায়াতের বৈশিষ্ট্যটি অনির্দিষ্ট হবে কোন ধরনের অপরাধী ও কোন কোন গুনাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিয়ামতের দিন কোন সময় (যেহেতু কিয়ামতের প্রতি দিন পৃথিবীর ৫০০০০ বছরের সমান) গৃহীত হবে তা কারো জানা নেই এবং কেউই জানে না তার ভাগ্যে ঐ শাফায়াত জুটবে কি না, তাই শাফায়াতের বিষয়টি গুনাহের প্রতি উৎসাহিত করার সুযোগ নেই।

তৃতীয়ত পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ এবং নিষ্পাপ রাসূল (সা.) ও ইমামদের বাণীসমূহ নিয়ে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় শাফায়াতের জন্য আল্লাহ বিশেষ শর্ত ও বৈশিষ্ট্যের নীতি গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ বলেন :

﴿يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾

"সেদিন কারো সুপারিশই ফল বয়ে আনবে না তার সুপারিশ ব্যতীত যাকে (কিয়ামতের দিন) পরম করুণাময় অনুমতি দান করবেন এবং তার কথায় সন্তুষ্ট হবেন। [২৯৫]

অন্যত্র বলেছেন,

﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾

"অর্থাৎ জুলুমকারীদের কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী নেই যার সুপারিশ গ্রাহ্য হতে পারে।" [২৯৬]

ইমাম সাদিক (আ.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

إنَّ شفاعتنا لن تنالُ مستخفاً بالصلاة

'আমাদের শাফায়াত নামাজের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের জন্য হবে না।'[২৯৭]

সুতরাং সুস্পষ্ট যে এ সকল শর্ত কাউকে গুনাহ করতে উৎসাহিত করতে পারে না। বরং মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য অর্জনে প্রচেষ্টা চালাতে উদ্বুদ্ধ করে যাতে করে নবী (সা.) ও আল্লাহর ওলীদের শাফায়াতের উপযুক্ত হতে পারে।

চতুর্থত শাফায়াতের প্রতিশ্রুতি মানুষকে গুনাহ করতে উৎসাহিত তো করেই না, বরং গুনাহকারীকে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে আশাবাদী করে এভাবে যে, তার মধ্যে বিশ্বাস জন্মায় সে নিজের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারবে। কারণ তার অতীতের মন্দকর্ম তার ভাগ্যের উপর অবিচ্ছেদ্য কালো পর্দা টেনে দেয় নি, তাই সে আল্লাহর ওলীদের সাহায্য নিয়ে এবং আল্লাহর পথে চলার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারবে এমন বিশ্বাস করে। সুতরাং শাফায়াত তাদের মধ্যে এ আশা জাগরুক রাখে যে, আল্লাহর ওলীদের

দোয়ার বরকতে ক্ষমা লাভের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ তাদের রয়েছে।

২। শাফায়াত পক্ষপাতিত্বমূলক মধ্যস্থতা গ্রহণের শামিল।

বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

কারো কারো মতে শাফায়াত হলো এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব এবং এ লক্ষ্যে একদল মধ্যস্থতাকারীর শরণাপন্ন হওয়া। ফলে একদল ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ হয় এবং এর মাধ্যমে আইনকে কলুষিত করা হয়। কিন্তু বস্তুত শাফায়াত আল্লাহর ওলীদের হতে ঐ সকল গুনাহগারের জন্য বিশেষ সাহায্য যারা আল্লাহ ও তাঁর ওলীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নি। প্রকৃত শাফায়াত তাদের ভাগ্যেই জুটবে যাদের হৃদয়ে ও মানসে পবিত্রতা ও পূর্ণতার প্রতি ঝোঁক রয়েছে। কিন্তু যাদের কোনরূপ ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য নেই তাদের অন্ধকার হৃদয়ে শাফায়াতকারীদের ঐশী আলো প্রতিফলিত হবে না ও তাদের হৃদয় আলোকিতও হবে না।

সুতরাং সাধারণ মানুষদের মাঝে সুপারিশের নামে প্রচলিত পক্ষপাতিত্বের সাথে ইসলামের শাফায়াতের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। যেমন,

১) পৃথিবীতে প্রচলিত সুপারিশের ক্ষেত্রে অপরাধী ব্যক্তি নিজে সুপারিশকারীকে মনোনিত করে কোন বিশেষ বিভাগের প্রধানের কাছে সুপারিশ করবে। যেহেতু সুপারিশকারীর ঐ প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রভাব রয়েছে, সেহেতু সে যেন সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তার অপরাধ ক্ষমা করিয়ে দেয় এবং তার উপর প্রযোজ্য আইনের বিধানকে নি‌ি য় করে দেয়ার লক্ষ্যে সে এ পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে শাফায়াতের মূল চাবিকাঠি ও ক্ষমতা আল্লাহর হাতে ন্যস্ত এবং তিনিই শাফায়াতকারীকে মনোনীত করেন। মহান আল্লাহ পূর্ণতা ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শাফায়াতকারীকে শাফায়াতের অধিকার দেন এবং মনোনীত শাফায়াতকারীর মাধ্যমে নিজের রহমত ও ক্ষমাকে বান্দাদের মধ্যে বণ্টন করেন।

২) ইসলামের শাফায়াতের ক্ষেত্রে শাফায়াতকারী প্রভু বা পালনকর্তা হতে এই অধিকার লাভ করেন। কিন্তু পৃথিবীতে প্রচলিত সুপারিশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ক্ষমতা সুপারিশকারীর হাতে ন্যস্ত এবং

সে আইনের বিরুদ্ধে তার ইচ্ছামত অন্যায় সুপারিশ করে। সে তার প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে বিচারককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যায় বিচারে বাধ্য করে। কিন্তু ঐশী সুপারিশে মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার বিপরীতে কিছুই ঘটে না, শুধু কাঙ্ক্ষিত বিষয়টির পরিবর্তন সাধিত হয়।

৩) পৃথিবীতে প্রচলিত সুপারিশসমূহ মূলত আইনের ক্ষেত্রে বৈষম্যতে পর্যবসিত হয়। এটি এভাবে ঘটে যে, সুপারিশকারী আইন প্রণয়নকারী অথবা আইন বাস্ত- বায়নকারীর উপর প্রভাব বিস্তার করে, ফলে আইনের প্রয়োগ শুধু দুর্বল ও ক্ষমতাহীনদের উপর কার্যকর হয়। এর বিপরীতে ঐশী শাফায়াত কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তিই আল্লাহর উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না এবং কোন অবস্থাতেই আইনের বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। তাই শাফায়াত হলো আল্লাহর অসীম রহমত ও ক্ষমার উপযুক্ত ব্যক্তিকে পবিত্রকরণের প্রক্রিয়া। এ কারণেই একদল লোক কিয়ামতের দিন শাফায়াত হতে বঞ্চিত থাকবে, কারণ তারা এতটা পাপিষ্ঠ যে, আল্লাহর অসীম রহমতেরও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নীতিতে কোন বৈষম্য নেই।

৪) শাফায়াত লাভকারী ব্যক্তিকে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। যেমন :

ক) আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং সেও আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ভীত থাকবে

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾

“তারা (ফেরেশতারা) আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তদের ব্যতীত অন্যদের জন্য সুপারিশ করবে না এবং তারা তাঁর শাস্তি- র ভয়ে ভীত।” [২৯৮]

খ) আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হওয়া, যেমন তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর একত্বে বিশ্বাসী হওয়া। তাঁর প্রেরিত নবীকে সত্যায়ন করা, নবীর স্থলাভিষিক্ত ইমামদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা এবং সৎকর্মশীল হওয়া। আল্লাহ বলেছেন :

﴿لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا﴾

অর্থাৎ *“যে করুণাময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, সে ব্যতীত আর কেউ শাফায়াতের অধিকারী হবে না।* (সূরা মারিয়াম : ৮৭)

গ) পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী হওয়া যাবে না :

﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾

"জুলুমকারীদের কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী নেই যার কথা শ্রবণ করা হবে।"

ঘ) নামাজের ক্ষেত্রে শিথিলতা করবে না :

إنَّ شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلوة

'নিশ্চয়ই আমদের শাফায়াত নামাজের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের ভাগ্যে জুটবে না।[২৯৯]

সুতরাং শাফায়াত গুনাহের প্রতি উৎসাহ দানকারীও নয় এবং অন্যায়ের প্রতি সবুজ সংকেত দানও নয়। এটি পক্ষপাতিত্বমূলক মধ্যস্থতাও নয়। নয় সৎকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখার উপকরণ, বরং এর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণমূলক ও গঠনমূলক ভূমিকা রয়েছে। এভাবে এরূপ কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে :

ক) আশাকে জাগরুক রাখা

প্রধানত মানুষের উপর তার মন্দ প্রবৃত্তির প্রভাবের কারণে মানুষ বড় ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে তার হৃদয়ের উপর হতাশার ছায়া পড়ে। এই হতাশাই তাকে আরো অপরাধে কলুষিত হতে বাধ্য করে। এই হতাশার বিপরীতে আল্লাহর ওলীদের শাফায়াতের আশা তাকে আরো অধিক গুনায় পতিত হওয়া হতে রক্ষা করে এভাবে যে, তাকে আশা দেয় যদি সে নতুন করে গুনায় পতিত না হয় ও নিজেকে সংস্কারে ব্রত হয়, তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে মহান আল্লাহ কর্তৃক পবিত্র ব্যক্তিবর্গদের শাফায়াতের বদৌলতে তার পূর্ববর্তী কর্মসমূহকে ক্ষমা করে দেয়ার।

খ) **আল্লাহর ওলীদের সাথে আধ্যা ক সম্পর্ক স্থাপন** :

নিশ্চিতভাবে যে ব্যক্তি শাফায়াতের আশা রাখে সে প্রচেষ্টা চালায় আল্লাহর ওলীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের। ফলে যে সকল কাজ তাদের খুশী করে তা করার চেষ্টা করে যাতে করে এই সম্পর্ক দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন না হয়।

গ) **শাফায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ অর্জনের প্রচেষ্টা** :

শাফায়াতের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তার পূর্ববর্তী কর্মসমূহের বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করে ভবিষ্যতের জন্য উন্নততর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত ব্যতিরেকে শাফায়াত লাভ করা যায় না। বস্তুত শাফায়াত একটি বিশেষ অনুগ্রহ যা একদিকে শাফায়াত লাভকারী ব্যক্তির মধ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া এবং অন্যদিকে শাফায়াতকারী ব্যক্তির সৎকর্ম ও আল্লাহর নিকট সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার সমন্বয়ে সাধিত হয়ে থাকে।

৩। **আমাদের জন্য সুপারিশকারীর প্রয়োজন কেন**?

কেউ কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, কেন আল্লাহ সরাসরি আমাদের গুনাহসমূহকে ক্ষমা না করে সুপারিশকারীর মধ্যস্থতায় তা করবেন?

উত্তর : মহান আল্লাহ বিশ্বজগতকে সর্বোত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন :

﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾

“যিনি সকল কিছুকে সর্বোত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন।” ৩০০

বিশ্বজগৎ মানুষের পথপ্রাপ্তি, পূর্ণতা ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যকারণের নীতির ভিত্তিতে সৃষ্ট হয়েছে। এখানে মানুষের সকল প্রাকৃতিক চাহিদা সাধারণ উপায় উপকরণের মাধ্যমে পূরণ হয়ে থাকে।

আল্লাহর অবস্তুগত নিয়ামতসমূহ, যেমন পথ নির্দেশনা, ক্ষমা লাভ প্রভৃতি বিশেষ প্রক্রিয়ায় মানুষের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে। কারণ প্রজ্ঞাময় আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাঁর আধ্যাত্মিক নিয়ামতগুলো বিশেষ মাধ্যমের দ্বারা মানুষের জন্য আসবে। সুতরাং বস্তুগত নিয়ামতের বিষয়ে যেমন প্রশ্ন করা যায় না যে, কেন আল্লাহ পৃথিবীকে সূর্য দ্বারা আলোকিত করেছেন, কেন সরাসরি (বস্তুর সাহায্য ছাড়া) আলোকিত করলেন না? তেমনি অবস্তুগত নিয়ামতের ক্ষেত্রেও এ প্রশ্ন সঠিক নয় যে, কেন আল্লাহ তাঁর ওলীদের মাধ্যমে নিজ ক্ষমা বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন?

শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মুতাহহারী বলেছেন, ‘মহান আল্লাহর কর্ম শৃ লাপূর্ণ। যদি কেউ বিশ্বের শৃ ল- ব্যবস্থার প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখায় তবে সে বিচ্যুত। এ কারণেই মহান আল্লাহ গুনাহকারী ব্যক্তিকে নির্দেশনা দিয়ে নিজের উপর জুলুম করে থাকলে তার ক্ষমার জন্য রাসূল

(সা.)- এর দ্বারস্থ হওয়ার কথা বলেছেন যাতে করে তিনি তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾

“যদি তারা (গুনায় পতিত হওয়ার মাধ্যমে) নিজের উপর জুলুম করে আপনার নিকট আসে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু হিসেবে পেত।” (সূরা নিসা: ৬৪) [৩০১]

শাফায়াতের অন্যতম কারণ হলো মহান আল্লাহ তাঁর নবী ও ওলিগণকে শাফায়াতের অধিকার দানের মাধ্যমে সম্মানিত করতে চেয়েছেন। তাঁদের প্রার্থনা ও আবেদন গ্রহণ তাঁদের প্রতি এক প্রকার মর্যাদা দানের শামিল। যেহেতু আল্লাহর ওলী, সৎকর্মশীল বান্দা, ফেরেশতামণ্ডলী এবং আরশ বহনকারী বিশেষ ফেরেশতাগণ সমগ্র জীবন আল্লাহর নির্দেশের অনুগত থেকে জীবন কাটিয়েছেন এবং কখনোই আল্লাহর বন্দেগী, আনুগত্য ও উপাসনার গণ্ডির বাইরে পা বাড়ান নি, সেহেতু তাঁরা সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত। তাঁদের মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় কী হতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত পাপী বান্দাদের তাঁদের দোয়ার বরকতে ক্ষমা করা হবে ও তাঁদের প্রার্থনা আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হবে।

৪। শাফায়াত আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যে পরিবর্তনকারী অর্থাৎ তাঁর সর্বজ্ঞ হওয়ার পরিপন্থী।

রশিদ রেজা বলেছেন, ‘আল্লাহর বিধানই হলো ন্যায় এবং ঐশী কল্যাণের নীতির ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে শাফায়াত বা সুপারিশ বলে যে বিষয়টি মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে তার অর্থ হলো মধ্যস্থতা ও সুপারিশকারী অপরাধীর উপর প্রকৃত বিধান কার্যকর হওয়ার প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। যদি সুপারিশের পর বাস্তবায়িত বিধানটি ন্যায়ের অনুরূপ হয় তবে যেহেতু প্রথম বিধানটি (সুপারিশের পূর্বের) তার বিপরীত ছিল তাই সেক্ষেত্রে দু’টি অবস্থা হতে পারে :

১) মহান আল্লাহকে ন্যায়পরায়ণ নন বলতে হবে, যা অবশ্যই ঠিক নয়।

২) বলতে হবে আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ, তবে তাঁর জ্ঞান অপূর্ণ ছিল। কারণ সুপারিশকারীর সুপারিশের পর তাঁর সিদ্ধান্ত ও জ্ঞানে পরিবর্তন এসেছে ও বাস্তবায়নযোগ্য ন্যায়সঙ্গত নতুন বিধান তাঁর হস্তগত হয়েছে।

এইরূপ চিন্তা অগ্রহণযোগ্য। কারণ আল্লাহর জ্ঞান তাঁর সত্তাগত এবং তাতে কোন পরিবর্তন আসতে পারে না। যদি ধরে নিই প্রথম বিধানটিই ন্যায় ছিল এবং দ্বিতীয় বিধানটি তার বিপরীত, তাহলে বিষয়টি দাঁড়াবে আল্লাহ শাফায়াতকারীর প্রতি ভালোবাসার কারণে ন্যায়কে পদদলিত করে নতুন বিধান কার্যকর করেছেন। এইরূপ চিন্তা আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতার নীতির পরিপন্থী। তাই শাফায়াতের বিষয়টি বিভিন্নমুখী প্রশ্নের সম্মুখীন এবং যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি তার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। [৩০২]

আমাদের জবাব

এই সমালোচনাটির উদ্ভব এজন্য হয়েছে যে, সমলোচক জ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে পরিবর্তনকে আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যে পরিবর্তন ভেবে নিয়েছেন। অর্থাৎ এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমাদের বুঝতে হবে যে, বিষয়টির মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে, তা হলো অপরাধী ও পাপীর অবস্থার অর্থাৎ তার অবস্থার পরিবর্তনের ফলে আল্লাহর অনুগ্রহের উপযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে তার মধ্যে এ অবস্থা বিরাজমান ছিল না। তাই আল্লাহর জ্ঞানে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি। সুতরাং আল্লাহর ক্ষেত্রে পূর্বেই দু'ধরনের ইচ্ছা ছিল এবং আল্লাহ পূর্ব হতেই জানতেন ঐ ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন আসবে এবং তাঁর দ্বিতীয় ইচ্ছার অধীনে সে রহমতে শামিল হবে। তাই তাঁর ইচ্ছার মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি, বরং দু'টি স্বতন্ত্র ইচ্ছা দু'টি ভিন্ন বিষয়ের উপর কার্যকর যার কোনটিই অপরটিকে প্রত্যাখ্যান করে না। বরং দু'টিই তাঁর ন্যায়ের অনুগত। এ কারণেই এতে আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যে কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা আসে না। বরং নতুন জ্ঞান ও ইচ্ছা নতুন এক বিষয়ের উপর আরোপিত হয় যা পূর্ব হতেই তিনি জ্ঞাত। যেমন আমরা জানি যে, রাত্রিতে সকল স্থান অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে তাই এই জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিই

যে, তখন বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করব। আবার জানি যে, সকালে সূর্য উদিত হবে, তখন বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে ফেলব। এই দুই জ্ঞান পরস্পর বিপরীত নয়, বরং বিষয়বস্তুর ভিন্নতায় ভিন্নরূপ বিধি বা নীতির প্রয়োগ হয়েছে মাত্র।

শাফায়াতের ক্ষেত্রেও আমরা বলি যে, মহান আল্লাহ পূর্ব হতেই জানতেন কোন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং তার বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর বিশেষ ইচ্ছা তার উপর প্রযোজ্য হবে। ফলে অবস্থা ও বিষয়ের পরিবর্তনে তার উপর বিভিন্ন রূপ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে। তাই এক্ষেত্রে আল্লাহর আদি ও অনন্ত জ্ঞান ও ইচ্ছায় কোন পরিবর্তন ও ভুলের বিষয় উত্থাপনের সুযোগ নেই। কারণ প্রতিটি জ্ঞানই তার নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য সঠিক এবং প্রতিটি ইচ্ছাই কল্যাণের নীতিতে তার উপযুক্ত বিষয়বস্তুর জন্য প্রজ্ঞাজনোচিত।

আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট নামাজ পড়া ও দোয়া করা

অন্যান্য মুসলমান ও ওয়াহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্যের অপর একটি বিষয় হলো এটি। একদিকে মুসলমানরা আল্লাহর ওলীদের জীবিতাবস্থা ও মৃত্যুর পর সকল অবস্থায় তাদের অস্তিত্বকে বরকতময় এবং তাদের সংস্পর্শে আসা প্রতিটি ভূমি, এমনকি তাদের কবর ও তৎসংলগ্ন স্থানকেও পবিত্র ও বরকতময় মনে করে। অন্যদিকে আল্লাহর ওলীদের জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় তাদের নিকট দোয়া চাওয়া ও তাদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট চাওয়াকে জায়েয মনে করে। ওলীদের কবরের নিকট নামাজ পড়ে এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করেন ও তাঁদের বরকতে শয়তান ও শয়তানের প্ররোচনা হতে রক্ষা পায়। সেই সাথে সমগ্র মনোযোগ যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় ও পূর্ণ নিষ্ঠা ও ইখলাসসহ তাঁর নিকট ইবাদত ও প্রার্থনা করতে পারে। এর বিপরীতে ওয়াহাবীরা এরূপ বিশ্বাসের বিরোধিতা করে একে নিষিদ্ধ বলে ফতোয়া দিয়েছে। এখন আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

ওয়াহাবীদের এ সম্পর্কিত ফতোয়াসমূহ

১। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, 'সাহাবীরা সাধারণত যখন রাসূলের কবরের নিকট যেতেন তখন তাঁর প্রতি সালাম বলতেন, কিন্তু যখন দোয়া করতেন তখন কবরের দিকে মুখ করে দোয়া করতেন না। বরং কবর হতে মুখ ফিরিয়ে কিবলার দিকে হয়ে দোয়া করতেন। অর্থাৎ অন্যান্য স্থানসমূহের ক্ষেত্রে যেমনটি করতেন রাসূলের কবরের ক্ষেত্রেও তাই করতেন। এ কারণেই আমাদের অনুসরণীয় ইমামদের কেউই বলেন নি যে, আল্লাহর ওলীদের শাহাদাতের স্থান বা কবরের নিকট নামায পড়া মুস্তাহাব বা উত্তম, বরং তাঁরা এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, মসজিদ অথবা গৃহসমূহ নবী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের কবর হতে উত্তম, কবরের স্থানটিকে জিয়ারতের স্থান বলা হোক না হোক।'[৩০৩]

অন্যত্র তিনি বলেছেন, ‘কবরের নিকট নামাজ পড়া জায়েয নয় এবং ইবাদতের উদ্দেশ্যে- তা যে কোন ইবাদত হোক না কেন, যেমন নামাজ, ইতিকাফ, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা, কান্নাকাটি করা এবং এরূপ যে কোন বিষয়- সেখানে জিয়ারতের স্থান (মাজার) বানানো জায়েয নয় ও মাকরুহ বলে গণ্য। বরং অনেক (ফিকাহর) ইমামই ঐরূপ স্থানে নামাজ পড়তে যে নিষেধ করা হয়েছে, তাকে নামাজ বাতিলকারী গণ্য করেছেন।’[৩০৪]

২। ইবনে কাইয়্যেম জাওযিয়া বলেছেন, ‘রাসূল (সা.) কবরের নিকট নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কবরের নিকট নামাজ পড়ে থাকে।’[৩০৫]

৩। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব বলেছেন, ‘পূর্ববর্তী ইমামদের (ফিকাহ্ বিশেষজ্ঞ) মধ্যে কেউই এ কথা বলেন নি যে, কবর বা মাজারের নিকট নামাজ পড়া মুস্তাহাব বা উত্তম। বরং তাদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে আল্লাহর ওলী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের কবরের নিকট নামাজ পড়া হতে মসজিদ ও গৃহে নামাজ পড়া উত্তম।’[৩০৬]

৪। শেখ আবদুল আজিজ ইবনে বাজ বলেছেন, ‘কবরের নিকট নামাজ পড়া বিদআত এবং শিরকের অন্যতম পথ

إجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم و لا تتّخذواها قبوراً

অথাৎ ‘তোমাদের নামাজসমূহের অংশ তোমাদের গৃহসমূহেই পড়, তাকে কবর বানিও না।’এ হাদীসটি হতে বোঝা যায় কবরের পাশে নামাজ পড়া উচিত নয় এবং নামাজ মসজিদ অথবা গৃহে পড়া উচিত।’[৩০৭]

কোন কোন ভূমি ও বিশেষ স্থানের বরকতময় হওয়া

পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ ও বিভিন্ন হাদীস হতে জানা যায় কোন কোন ভূমি বা স্থান বরকতপূর্ণ। এ কারণে ঐ সকল স্থানের অন্যান্য স্থানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এর বিপরীতে বেশ কিছু ভূমি বরকতশূন্য ও আল্লাহর গজব অবতীর্ণের স্থান হওয়ায় দ্রুত সেখান হতে প্রস্থানের নির্দেশ রাসূলের হাদীসে এসেছে।

ক) **আল কোরআনে বরকতময় স্থানের উল্লেখ** :

মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾

"নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেটা হচ্ছে এ ঘর যা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত এবং সারা বিশ্বের (মানুষের) জন্য বরকতময় ও হেদায়েতের উপকরণ।" [৩০৮]

﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾

"আমি তাঁকে ও লুতকে উদ্ধার করে এমন স্থানে পৌঁছে দিলাম যাকে বিশ্ববাসীর জন্য বরকতময় করেছিলাম।" [৩০৯]

মহান আল্লাহ হযরত মূসা সম্পর্কে বলেছেন :

﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾

"যখন তার প্রতিপালক পবিত্র তুবা উপত্যকায় তাকে আহ্বান করেছিলেন।" [৩১০]

অন্যত্র মূসা (আ.)- এর প্রতি সম্বোধন করে বলেছেন :

﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾

"তুমি তোমার পাদুকা খুলে ফেল, নিশ্চয়ই তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ।" [৩১১]

হযরত সুলাইমান (আ.) সম্পর্কে বলেছেন :

﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾

"এবং সুলাইমানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে যা তার নির্দেশে এমন এক ভূমির দিকে প্রবাহিত হতো যেখানে আমি বরকত (কল্যাণ) দান করেছিলাম।" [৩১২]

মহানবী (সা.) সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন :

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾

"পরম পবিত্র সেই সত্তা স্বীয় বান্দাকে রাত্রিতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত- যার চারিদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি।" [৩১৩]

খ) **রেওয়ায়েতসমূহ** : কখনো কখনো হাদীসে কোন কোন ভূমি ভালো অথবা মন্দ বৈশিষ্ট্যে অভিহিত হয়েছে।

১) বুখারী আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন 'মহানবী (সা.) যখন সামুদ জাতির বাসস্থানের উপর দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন বলেছিলেন, 'তোমরা ঐ সকল ভূমিতে প্রবেশ করো না যে ভূমির অধিবাসীরা নিজেদের উপর জুলুম করেছে ও আল্লাহর আজাবে পতিত হয়েছে। কারণ, তোমাদের উপরই ঐরূপ আজাব পতিত হতে পারে (তোমাদের অনুরূপ অপরাধের কারণে), তবে যদি ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ কর তবে ভিন্ন কথা।'এ কথা বলে মহানবী (সা.) নিজ মাথা আবৃত করে দ্রুত স্থানটি অতিক্রম করলেন।[৩১৪]

২) বুখারী অন্যত্র বর্ণনা করেছে হযরত আলী বাবেলের ভূমিধসে ধ্বংস হওয়া ভূমিতে নামাজ পড়তে অপছন্দ করতেন।[৩১৫]

৩) হালাবী তাঁর সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, 'এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, যে স্থানটি মহানবী (সা.)- এর পবিত্র দেহ মোবারক ধারণ করে আছে তা পৃথিবীর উপর সর্বোত্তম স্থান। এমনকি পবিত্র কাবাগৃহের স্থান হতেও। কেউ কেউ বলেছেন, 'বিশ্বের মধ্যে তা সর্বোত্তম স্থান, এমনকি আল্লাহর আরশ হতেও।'[৩১৬]

৪) সামহুদী শাফেয়ী মদীনার ভূমি অন্য সকল ভূমি হতে উত্তম- এ কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এর দ্বিতীয় কারণ হলো এ ভূমি এমন এক টুকরা ভূমিকে ধারণ করে আছে যার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে যে, তা পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠ স্থান। আর সেটি হলো ঐ ভূমি যা মহানবী (সা.)- এর পবিত্র দেহ মোবারক ধারণ করে আছে।'[৩১৭]

৫) তিনি আরো বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.)- এর ওফাতের পর লোকজন তাঁর কবরের নিকট আসত এবং তাঁর পবিত্র কবরের মাটি বরকত হিসেবে নিয়ে যেত। হযরত আয়েশা রাসূলের দেহকে প্রকাশিত হওয়ার হাত হতে রক্ষার প্রয়োজনে তাঁর কবরের চারিদিকে দেয়াল নির্মাণের নির্দেশ দেন।[৩১৮]

কবরের নিকট নামাজ ও দোয়া পাঠ মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দলিল

১। মহানবী (সা.) অথবা অন্য যে কোন আল্লাহর ওলীর কবরের নিকটের ভূমি অন্য স্থানসমূহের মতো ভূমি হিসেবে বিবেচিত। তাই যে কোন ভূমি ও স্থানে যেরূপ নামাজ পড়া জায়েয ঐ স্থানগুলো তার হতে ব্যতিক্রম নয়।

২। মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾

"যখন তারা (মুশরিকরা) নিজেদের উপর জুলুম করেছিল তখন যদি রাসূলের নিকট আসত এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তবে তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও দয়ালু হিসেবে পেত।" (সূরা নিসা: ৬৪)

উপরিউক্ত আয়াতটিতে ((جاءوک)) শব্দ এসেছে যা সকল কালকেই শামিল করে অর্থাৎ রাসূলের জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায়ই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলের জীবদ্দশায় যেমন মানুষ গুনাহ করত, তাঁর ইন্তেকালের পরও তারা গুনাহ করবে, এটাই স্বাভাবিক, তাই তারা ক্ষমার জন্য সবসময়ই এরূপ মাধ্যমের মুখাপেক্ষী। তারা যাঁর শরণাপন্ন হবে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার কারণে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। তাই নামাজ ও দোয়া যা ক্ষমা প্রার্থনার উপকরণ তা রাসূলের কবরের নিকট সম্পাদিত হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ এরূপ ইবাদত তাঁর কবরের নিকট হলে তাঁর বরকতে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

৩) নিঃসন্দেহে কোন গোরস্তানে কবরবাসীর ইবাদতের উদ্দেশ্যে এবং কবরকে কিবলা বানিয়ে নামাজ পড়া হারাম ও শিরক বলে পরিগণিত। কিন্তু কোন মুসলমানই এরূপ কাজ করে না। এমন

নিয়তেও কেউ কবরের নিকট নামাজ পড়তে যায় না। বরং মুসলমানরা আল্লাহর ওলীদের পবিত্র দেহ মোবারক হতে বরকত লাভের উদ্দেশ্যেই তাঁদের কবরের নিকট নামাজ পড়ে ও দোয়া করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে এরূপ স্থানে নামাজ ও দোয়ায় অধিক সওয়াব রয়েছে। যদি ঐ স্থানের মর্যাদা ও বরকত না- ই থাকবে, তবে কেন প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা রাসূলের কবরের পাশে নিজেদের সমাধিস্থ করার সুপারিশ করেছিলেন? ঐ স্থান বরকতময় হওয়ার কারণেই নয় কি? মুসলমানরাও আল্লাহর ওলীদের কবরের পাশে একই নিয়তে নামাজ পড়ে থাকে।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আসাহবে কাহফের স্বজাতি একত্ববাদী মুমিনরা কেন তাঁদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন? নিশ্চয়ই তাঁদের ফরজ নামাজ ও ইবাদতসমূহ তাঁদের কবরের নিকটে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাতে করে সেখান হতে বরকত লাভ করতে পারেন। এ কারণেই জামাখশারী সূরা কাহফের ২১ নং আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, ‘তাদের প্রস্তাব এ লক্ষ্যেই ছিল যে, যাতে করে মুসলমানরা সেখানে নামাজ পড়তে পারে ও তাঁদের কবর হতে বরকত লাভ করতে পারে।’[৩১৯]

মহান আল্লাহ আসহাবে কাহফের স্ব জাতির মুমিন ব্যক্তিদের প্রস্তাবকে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন, অথচ তার কোন প্রতিবাদ না করে নিরবতা পালন করেছেন। বিষয়টি জায়েয ও বৈধ হওয়ার সপক্ষে এটি একটি শক্তিশালী দলিল।

৪) মহান আল্লাহ হাজীদের নির্দেশ দিয়েছেন হযরত ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানে (মাকামে ইবরাহীমে) নামাজ পড়ার। মাকামে ইবরাহীম হলো ঐ স্থান যে পাথরটির উপর হযরত ইবরাহীম (আ.) কাবাগৃহ নির্মাণের সময় দাঁড়িয়েছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾

“(স্মরণ কর) যখন আমি কাবগৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলন স্থান ও শান্তির আলয় করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাজের স্থান বানাও।” (সূরা বাকারা : ১২৫)

আমরা অবগত যে, ঐ স্থানটির নিকট নামাজ পড়ার নির্দেশ এ জন্য যে, যাতে করে তা হতে নামাজ আদায়কারী বা হাজী বরকত লাভ করতে পারে।

৫) আল্লামা সুয়ূতী মিরাজ সম্পর্কিত হাদীসের আলোচনায় বলেছেন, 'মহানবী (সা.) মদীনা, সিনাই প্রান্তরের তুর পর্বত, বাইতে লাহাম (বেথেলহাম) সহ যে স্থানেই মিরাজের রাত্রে গিয়েছেন, নামাজ পড়েছেন। প্রতিটি নামাজের স্থানে জীবরাইল (আ.) মহানবীকে স্থানটি পরিচয় করিয়ে দেন। যেমন মদীনায় বলেন, 'হে রাসূল! আপনি কি জানেন, কোথায় নামাজ পড়ছেন? আপনি এক পবিত্র শহরে নামাজ পড়ছেন যেখানে আপনি হিজরত করবেন।'সিনাইয়ের তুর পর্বতের নিকট বলেন, 'এটি সেই স্থান যেখান আল্লাহ হযরত মূসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।'বেথেলহামে বলেন, 'এটি হযরত ঈসা (আ.)- এর জন্মস্থান।[৩২০]

সুতরাং আমাদের নিকট স্পষ্ট যে, বেথেলহাম হযরত ঈসার জন্মস্থান হিসেবে বরকতময় হয়েছে এবং এ কারণেই মহানবী (সা.) সেখানে নামাজ পড়েছেন। হযরত ঈসার জন্মস্থানে তাঁর কোন শারীরিক উপস্থিতি না থাকলেও কেবল স্মৃতিচিহ্ন হওয়ার কারণে তা সম্মানিত। এর বিপরীতে যেখানে আল্লাহর ওলীদের কবর রয়েছে, তা তার দেহের উপস্থিতির কারণে অবশ্যই বরকতময়।

৬) মুসলমানরা হজ্বের সময় হিজরে ইসমাঈলের নিকট নামাজ পড়ে থাকে, অথচ ঐ স্থানটিতে হযরত ইসমাঈল ও তাঁর মাতার (হাজরা) কবর অবস্থিত। হযরত ইসমাঈলের সঙ্গে মহানবী (সা.)- এর কবরের কি পার্থক্য রয়েছে?

৭) যদি রাসূলের কবরের পাশে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হয়, তবে কেন হযরত আয়েশা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কবরের নিকট অবস্থান করেছেন ও সেখানে নামাজ পড়েছেন? নারীকূল শিরোমণি হযরত ফাতিমা (আ.) যাঁর ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন : 'ফাতিমার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি', তিনি কেন রাসূলের জীবদ্দশায় প্রতি জুমআর দিন (শুক্রবার) হযরত হামজার কবরের নিকট যেতেন ও সেখানে নামাজ পড়তেন?

৮) মহানবী (সা.) কি মসজিদে খিফে নামাজ পড়েন নি, অথচ রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে ঐ মসজিদটি সত্তরজন নবীর দাফনের স্থান [৩২১] - যে হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং তাবরানী তাঁর হাদীস গ্রন্থে তা এনেছেন।

৯) মহানবী (সা.) কি হযরত ইবরাহীমের কবরের নিকট নামাজ পড়েন নি?

আবু হুরাইরা মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'জীবরাঈল (আ.) যখন আমাকে মিরাজের রাত্রিতে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যান, তখন হযরত ইবরাহীমের কবরের নিকট নামিয়ে দিয়ে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এখানে দু'রাকআত নামাজ পড়ুন। কারণ এখানে হযরত ইবরাহীমের কবর। অতঃপর বেথেলহামে নিয়ে যান ও বলেন : হে আল্লাহর নবী! এখানেও দু'রাকআত নামাজ পড়ুন। কারণ আপনার ভ্রাতা ঈসা এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন।'[৩২২]

১০) ইসলামের ঐতিহাসিক পরিক্রমায় সবসময় মুসলমানরা চেষ্টা করেছে আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট নামাজ পড়ার। চিরাচরিত এ সুন্নাতকে জীবিত রাখতে তাদের মাথায় কখনো এ কর্ম হারাম হওয়ার কথা আসে নি। আব্বাসীয় খলিফা মানসুর দাওয়ানেকী একদিন রাসূলের কবরের নিকট দাঁড়িয়ে মালিকী মাজহাবের প্রবক্তা মালিক ইবনে আনাসকে প্রশ্ন করলেন, 'হে আবা আবদুল্লাহ্! কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে দোয়া করব, নাকি রাসূলের কবরের দিকে মুখ করে?

মালিক ইবনে আনাস বললেন, 'কেন রাসূলের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইছ? জেনে রাখ, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার সহ তোমার পিতা আদমের মুক্তির মাধ্যম। তাই তাঁর দিকে মুখ ফিরাও এবং তাঁকে নিজের জন্য আল্লাহর নিকট শাফায়াতকারী হিসেবে পেশ কর যাতে করে তোমার দোয়া গৃহীত হয়।'[৩২৩]

আহলে সুন্নাতের আলেমদের এ সম্পর্কিত ফতোয়া

আহলে সুন্নাতের ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় তাঁদের সকলেই- ওয়াহাবীরা ব্যতীত- এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট নামাজ পড়া ও দোয়া করা জায়েয। যেমন-

১) আল মুদাববিনাতুল কুবরা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : মালিক ইবনে আনাস কবরসমূহের নিকট নামাজ পড়াতে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করতেন না। যদি নামাজী ব্যক্তি ঐ কবরগুলোর নিকট এমনভাবে নামাজ পড়ে যে, তার সামনে- পেছনে এবং ডানে- বামে কবর রয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, 'আমি অনেকের নিকটই শুনেছি মহানবী (সা.)- এর সাহাবীরা কবরস্থানের নিকট নামাজ পড়তেন।'[৩২৪]

২) আবদুল গণি নাবলুসী তাঁর 'আল হাদীকাতুন নাদিয়া' গ্রন্থে বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি কোন সৎকর্মশীল বান্দার কবর হতে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর কবরের নিকট নামাজ পড়ে এবং তার ঐ কবরবাসী ব্যক্তির প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছা ও তাঁর প্রতি মনোযোগ না থাকে, তবে তার নামাজে কোন সমস্যা নেই। কারণ মসজিদুল হারামের হাতিমের নিকটে হযরত ইসমাঈলের কবর থাকা সত্বেও সেটি নামাজ পড়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান।'[৩২৫]

৩) খাফফাজী তাঁর 'শারহুশ শিফা' গ্রন্থে বলেছেন, 'রাসূলের রওজার... মুখ করে কাবাকে পিছনে ফেলে দোয়া করা শাফেয়ী মাজহাব ও আহলে সুন্নাতের সকল আলেমের মতেই জায়েয। এ বিষয়ে আবু হানিফার মতও তা- ই।[৩২৬]

৪) ইবনুল হুমাম হানাফী আলেমদের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি বলেন, 'আবু হানিফা সম্পর্কে যে বলা হয়ে থাকে তিনি রাসূলের কবরের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে দোয়া করতেন, তা সঠিক নয়। কারণ তা সুন্নাতের পরিপন্থী।... কেরমানী এ সম্পর্কে বলেছেন, 'আবু হানিফার মত- কিবলার দিকে দাঁড়িয়ে রাসূলের কবরকে পিছনে রেখে দোয়া করা- গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মহানবী (সা.) তাঁর রওজায় এখনো জীবিত আছেন এবং তাঁর জিয়ারতকারীকে চিনেন।'[৩২৭]

ওয়াহাবীদের উপস্থাপিত দলিলের পর্যালোচনা

ওয়াহাবীরা আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকটে নামাজ পড়া ও দোয়া করা হারাম ও নাজায়েয হওয়ার সপক্ষে দু'ধরনের দলিল উপস্থাপন করেছে।

ক) নাসিরুদ্দীন আলবানী রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, 'কবরের দিকে মুখ করে ও কবরের উপর নামাজ পড় না।'[৩২৮]

উত্তর : প্রথমত ওয়াহাবী আলেমগণ শুধু নিজেদের হাদীসকে অন্যদের হাদীসগুলোকে প্রত্যাখ্যানের দলিল বানাতে পারেন না। কারণ বিপরীত পক্ষের হাদীসগুলোও প্রমাণিত। এ কারণেই ইবনে হাজাম তাঁর 'আল ফিসাল' গ্রন্থে বলেছেন, 'আমরা শিয়াদের আকীদাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে আমাদের হাদীসগুলো প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি না। কারণ তারা তা গ্রহণ করবে না। তেমনি শিয়ারাও তাদের বর্ণিত হাদীসকে আমাদের বিপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে না।'[৩২৯]

দ্বিতীয়ত কোন কোন হাদীসে সুস্পষ্টভাবে কবরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে ও কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করতে (যা তাকে الله বা উপাস্যের পর্যায়ে পৌঁছায়) নিষেধ করা হয়েছে, কারণ তা ধর্মের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও শিরকে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু যদি বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তা করা হয় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

বাইদ্বাভী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেছেন, 'রাসূলের যুগে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা তাদের নবীদের কবরের প্রতি সম্মান দেখাতে সিজদা করত এবং সেদিকে মুখ করে নামাজ পড়ত। প্রকৃতপক্ষে তারা ঐ কবরগুলোকে মূর্তির ন্যায় সিজদা করত। এ কারণেই রাসূল (সা.) তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন ও এরূপ করা হতে মুসলমানদের বিরত থাকতে বলেছেন।[৩৩০]

এখন যদি কেউ আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট তাঁদের প্রতি সম্মান দেখানো ও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের নিয়তে নামাজ না পড়ে বরং তাঁদের কবর হতে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সেখানে নামাজ পড়ে ও দোয়া করে তবে কি তা শিরক হবে? কখনোই নয়। কারণ মানুষ ঐ পবিত্র স্থানে এ জন্য নামাজ পড়ে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর বিশেষ প্রিয় বান্দা, সে তাওহীদ ও একত্ববাদের ধারক ও প্রচারক। তাই তাঁর কবরের নিকট নামাজ পড়লে নামাজের ক্ষেত্রে অধিকতর মনোযোগ

ও আল্লাহর প্রতি অধিক নৈকট্য অনুভূত হয় এবং ইখলাস অর্জন করা যায়। তাই এক্ষেত্রে কোন অসুবিধা তো নেই, বরং তা পছন্দনীয়।

খ) শিরকের পথ রোধের মূলনীতি : ওয়াহাবী আলেমদের কেউ কেউ, যেমন শেখ আবদুল আজীজ বিন বায উল্লিখিত মূলনীতির ভিত্তিতে বলেছেন, ‘যেহেতু আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট নামাজ পড়া ও দোয়া করাতে শিরকে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই তা হারাম ও বাতিল বলে গণ্য।’[৩৩১]

উত্তর : উসূলশাস্ত্রের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হারামে পৌঁছাতে পারে এরূপ সকল মাধ্যমই হারাম নয়। বরং যে মাধ্যম ও কর্ম সরাসরি মানুষকে হারামে ফেলে শুধু তা- ই হারাম। নামাজ ও দোয়ার ক্ষেত্রেও যা তাকে সরাসরি ও নিশ্চিতভাবে হারামে ফেলে তা- ই হারাম, কিন্তু যে নামাজ ও দোয়া এরূপ নয়, তা হারাম নয়, বরং জায়েয ও মুস্তাহাব। প্রায় সকল মুসলমানই আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট তাঁদের ইবাদতের উদ্দেশ্যে বা তাঁদের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন- যা তাঁদের উপাস্যের পর্যায়ে পৌঁছায়- করতে সেখানে নামাজ পড়ে না বা দোয়া করে না, বরং তারা কেবল তাঁদের কবর হতে বরকত লাভের উদ্দেশ্যেই তা করে।

আল্লাহর ওলীদের জন্য শোক পালনের দর্শন

[ইমাম হুসাইন (আ.)- এর জন্য ক্রন্দন ও শোক পালনের দর্শন]

কেন আমরা আল্লাহর ওলীদের শোকে মাতম করব? তাঁরা কি আমাদের শোক পালনের মুখাপেক্ষী? কেন আমরা অতীতের ঘটনাসমূহের স্মরণ করব? ওয়াহাবীরা এরূপ কর্মকে 'বিদআত' বলে জানে এবং শিয়াদেরকে এরূপ কর্মের জন্য সমালোচনা ও নিন্দা করে।[৩৩২]

এখানে আমরা উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়ার চেষ্টা করব। প্রথমে আজাদারী বা শোক পালনের দলিলসমূহ উপস্থাপন করছি।

১। **শোক পালন ভালোবাসা ও ঘৃণার প্রকাশ**

ভালোবাসা ও বিদ্বেষ- এ দু'টি বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে রয়েছে। এ দু'টি বিষয় কারো প্রতি আকর্ষণ ও কারো প্রতি বিকর্ষণের আত্মিক রূপ।

যাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা অপরিহার্য

বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনাগত (কোরআন ও হাদীসভিত্তিক) দলিলের ভিত্তিতে কারো কারো প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা অপরিহার্য। যেমন :

ক) **আল্লাহ** : মহান আল্লাহ যেহেতু সকল পূর্ণতার গুণাবলীতে গুণান্বিত ও সকল ত্রুটি হতে মুক্ত এবং সকল সৃষ্টি তাঁর উপর সত্তাগতভাবে নির্ভরশীল। তাই তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকৃতিগত। ধর্মীয় নির্দেশেও তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণের ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে এসেছে-

﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

“বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের ী, তোমাদের বংশ ও গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন- সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান- যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।” (সূরা তাওবাহ্ : ২৪।)

খ) **আল্লাহর রাসূল** (.**সা**) : অপর যাঁকে আল্লাহর কারণে আমাদেরকে অবশ্যই ভালোবাসতে হবে তিনি হলেন তাঁর রাসূল। কারণ তিনি হলেন মহান আল্লাহর অস্তিত্বগত (তাকভীনি) ও বিধানগত (তাশরীয়ি) উভয় রহমত অবতীর্ণের মাধ্যম। এ কারণেই উক্ত আয়াতে আল্লাহর পাশাপাশি তাঁর নাম এসেছে এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মহানবী (সা.) বলেছেন :

احبُّوا الله لما يغذوكم و احبّونى بحبِّ الله

‘আল্লাহকে এ জন্য ভালোবাস যে, তিনি তোমাদের জীবিকা দেন এবং আমাকে আল্লাহর কারণে ভালোবাস।’[৩৩৩]

অন্যদিকে মহানবী (সা.)- এর মধ্যে যে পূর্ণতামূলক গুণাবলী ছিল তার কারণে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো এবং তাঁর ভালোবাসা তাদের হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল।

গ) **মহানবী এর পবিত্র বংশধর** -(.**সা**) : রাসূলের পবিত্র বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করাও অপরিহার্য। কারণ তাঁরা উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ও পূর্ণতার গুণসম্পন্ন হওয়া ছাড়াও আল্লাহর সকল আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত নিয়ামতের মাধ্যম হলেন তাঁরা। এ কারণেই রাসূল তাঁদের ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছেন।

মহানবী (সা.) পূর্বোক্ত হাদীসটিতে আরো বলেছেন :

و احبّوا اهل بيتى لحبّى. আমার বংশধরদের আমার ভালোবাসার কারণে ভালোবাস।

আল্লাহর রাসূল (সা.)- এর বংশধরদের ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহর রাসূলের বংশধরদের রাসূলের ন্যায় ভালোবাসার সপক্ষে দলিল:

১। রাসূলের বংশধরগণ রাসূলের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা বিশেষ মর্যাদার। এ কারণেই রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘কিয়ামতের দিন সকল সর্ম্পক ছিন্ন হয়ে যাবে, শুধু আমার সাথে সম্পর্ক ব্যতীত।’

২। আল্লাহর রাসূলের বংশধরগণ আল্লাহর বিশেষ ভালোবাসার পাত্র। এ বিষয়টি হাদীসে কিসাসহ[৩৩৪] অন্যান্য হাদীসে এসেছে।

৩। মুহাম্মদ (সা.)- এর রিসালাতের প্রতিদান তাঁর আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা পোষণের মাধ্যমে দেয়া হয়। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন-

﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾

“*বলুন, আমি আমার রিসালাতের দায়িত্ব পালনের বিপরীতে কোন প্রতিদান চাই না, আমার রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা পোষণ ছাড়া।*” (সূরা শুরা : ২৩)

৪। কিয়ামতের দিন রাসূলের আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসার বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, وقِفُوهم إنّهُم مَسئولون “তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে।” [৩৩৫]

উপরিউক্ত আয়াতের বিষয়ে সিবতে ইবনে জাওযী মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন, ‘কিয়ামতের দিন হযরত আলীর প্রতি ভালোবাসা পোষণের বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।’[৩৩৬]

৫। মহানবীর আহলে বাইত পবিত্র কোরআনের সমকক্ষ হিসেবে সম্মানের ও ভালোবাসার পাত্র। যেমনটি হাদীসে সাকালাইনে বলা হয়েছে-

إنّی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی أهل بیتی إن تمسکتم بهما لن تضلّوا ابداً... فانظروا بم تخلفونی فیهما

‘আমি তোমাদের মাঝে দু’টি ভারী (মূল্যবান) বস্তু রেখে যাচ্ছি : আল্লাহর কিতাব (কোরআন) ও আমার রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় (আহলে বাইত)। যদি তোমরা এ দু’টিকে আঁকড়ে ধর কখনোই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হবে না. লক্ষ্য রেখ, তাদের ক্ষেত্রে আমার সম্মান রক্ষা কর।’

৬। আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা সুন্নী- শিয়া উভয় সূত্রে সহীহ্ হাদীস মতে ঈমানের শর্ত। এ কারণেই মহানবী (সা.) হযরত আলীকে বলেছেন,

‘হে আলী, তোমাকে মুমিন ব্যতীত ভালোবাসবে না এবং মুনাফিক ব্যতীত তোমার প্রতি কেউ বিদ্বেষ পোষণ করবে না।’

৭। আহলে বাইত রাসূলের উম্মতের মুক্তির তরী। শিয়া- সুন্নী উভয় সূত্রে মহানবী (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, ‘আমার আহলে বাইতের দৃষ্টান্ত তোমাদের মাঝে নূহের তরণীর ন্যায়, যে তাতে আরোহণ করবে মুক্তি পাবে এবং যে না উঠবে নিমজ্জিত ও ধ্বংস হবে।’

৮। আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা আমল কবুলের শর্ত। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ‘যদি আমার উম্মত এতটা রোজা রাখে যে, তাতে তাদের কোমর বাঁকা হয়ে ধনুকের মতো হয়, এতটা নামাজ পড়ে যে সূতায় পরিণত হয়, কিন্তু অন্তরে তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তবে আল্লাহ্ তাদের মুখে জাহান্নামের আগুন লে   দিবেন অর্থাৎ তাদের দোযখে নিক্ষেপ করবেন।’[৩৩৭]

উক্ত হাদীসসমূহ হতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শোকানুষ্ঠান পালন তাঁদের প্রতি ভালোবাসারই প্রকাশস্বরূপ।

খ) বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহর ওলীদের জন্য   ন্দন:

১। আল্লাহর নবীর আহলে বাইতের জন্য (বিশেষত ইমাম হুসাইনের জন্য) ক্রন্দন তাঁদের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ এবং বুদ্ধিবৃত্তি তা সমর্থন করে।

২। আহলে বাইতের জন্য অশ্রু বর্ষণ বিশেষত ইমাম হুসাইনের জন্য অশ্রুত্যাগ আল্লাহর নিদর্শনকে জাগরুক করার ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতীক।

৩। ইমাম হুসাইনের জন্য ক্রন্দন প্রকৃতপক্ষে পূর্ণতার সকল গুণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনের শামিল। কারণ ইমাম হুসাইনের প্রতি ভালোবাসা নিছক ব্যক্তিকেি ক কোন বিষয় নয়, বরং ইসলামের পূর্ণতার সকল দিক তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল এবং তিনি আল্লাহর দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করতে মজলুমভাবে শহীদ হয়েছেন। তাঁর জন্য

ক্রন্দন মূলত সত্য ও ন্যায়ের জন্যই ক্রন্দন। তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমেই সত্য ও ন্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁর লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতির পরিচয় লাভের মাধ্যমেই ইসলামের পরিচয় লাভ করা যায়। আর তাই হাদীসে তাঁর শাহাদাতের স্মরণে ক্রন্দনের সওয়াব সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যে কেউ ইমাম হুসাইনের জন্য ক্রন্দন করবে অথবা কাউকে কাঁদাবে অথবা অন্তত কান্নার ভাব করবে, তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হবে।'কারণ ইমাম হুসাইনের পরিচয় এবং তাঁর অবিস্মরণীয় কর্মের সাথে পরিচয় লাভের ফলে মানুষ আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন ও তাঁর জন্য আত্মত্যাগে উৎসাহিত হয়।

৪। মানুষ যতক্ষণ তার অভ্যন্তরীণ সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তন না করে এবং আল্লাহর বিশেষ বান্দার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত না করে ততক্ষণ তার অন্তর নরম হয় না, তার কান্নাও আসে না। তাই ইমাম হুসাইনের মতো ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করার মাধ্যমে মানুষ যখন নিজের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তখন সে মূলত নিজ সীমিত অন্তরের সঙ্গে অসীম এক অন্তরের সম্পর্ক স্থাপন করে। সুস্পষ্ট যে, এরূপ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মানুষ অসীমের সাথে সংযুক্ত হয়। যেমনভাবে, কোন ক্ষুদ্র গর্তে জমা পানিকে যদি অসীম সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত করা না হয় ঐ স্ব পানি অসীমের সংস্পর্শ ছাড়া দুর্গন্ধময় হয়ে যায় অথবা রৌদ্রতাপে শুকিয়ে যায়। কিন্তু যদি ঐ ক্ষুদ্র পানিকেই মহাসমুদ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় তবে ঐ ক্ষুদ্র পানিটুকুই সকল প্রকার কলুষতা থেকে মুক্ত ও ধ্বংস হতে রক্ষা পায়।

৫। মজলুম ব্যক্তির (যার প্রতি অবিচার করা হয়েছে, অন্যায় করা হয়েছে ও তার অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে) জন্য ক্রন্দন মানুষকে তার প্রতি সহানুভূতিশীল করে, ফলে সে নিজেকে ঐ মজলুমের সপক্ষ ভাবে বিশেষত ঐ মজলুম যদি কোন নবী, তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি ও নিষ্পাপ কোন ব্যক্তি হয়, তাহলে তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী ব্যক্তি শরীয়ত ও তাঁর আনীত দ্বীনের রক্ষক হওয়ার ব্রত নেয়। মনস্তত্ত্ববিদগণ এ বিষয়টি সমর্থন করেন। তাই আমরা ইতিহাসের পরিক্রমায় লক্ষ্য করি শিয়ারা ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের শোকাবহ ঘটনা হতে আত্মজাগরণের সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণের কারণে সবসময়ই নির্যাতিত ও মজলুমের সমর্থক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

৬। আল্লাহর ওলীদের জন্য ক্রন্দন বিশেষত ইমাম হুসাইনের জন্য ক্রন্দন দ   হৃদয়ের জন্য প্রশান্তির কারণ। ইমাম হুসাইনের উপর আপতিত মুসিবতের স্মরণে হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় (তাঁর ভালোবাসায় পূর্ণ ব্যক্তির হৃদয়ে) তাঁর জন্য অশ্রু বিসর্জন ঐ দ   হৃদয়কে উপশমে সাহায্য করে।

৭। আল্লাহর ওলীদের জন্য ক্রন্দন মানুষের হৃদয়কে নরম করে তাদের হৃদয় হতে কলুষতাকে দূর করে। ফলে তার হৃদয় ঐশী নূরে আলোকিত হওয়ার সুযোগ পায়। ঐ অশ্রু তার অন্তরের মরিচা দূর করতে সাহায্য করে।

৮। ইমাম হুসাইনের জন্য ক্রন্দন অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে এক প্রকার বাস্তব সংগ্রাম। এর মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় অত্যাচারী শাসকদের আচরণের প্রতি আমরা বীতশ্রদ্ধ ও ক্রন্দন তাদের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ। এ কারণেই মহানবী (সা.)- এর ইন্তেকালের পর সাকীফায়ে বনী সায়েদায় হযরত আলী (আ.)- এর অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার প্রতি উত্তরে হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.) বিরামহীন ক্রন্দনের মাধ্যমে আনসার ও মুহাজিরদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের অন্যায় কর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট। যদিও রাসূলের আহলে বাইত ছিলেন ধৈর্য ও সহি ুতার মূর্ত প্রতীক ও এক্ষেত্রে মানব জাতির জন্য আদর্শ, কিন্তু তাঁরা এ কর্মের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি কৃত অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন ও সকলকে তা অবহিত করেছেন।

৯। শিয়ারা আহলে বাইতের, বিশেষত শহীদদের নেতা ইমাম হুসাইনের জন্য ক্রন্দনের মাধ্যমে ঘোষণা করে : আমরা ইতিহাসের পরিক্রমায় ইয়াযীদ ও ইয়াযীদের অনুসারীদের বিরোধী এবং ইমাম হুসাইন ও তাঁর মতো ব্যক্তিত্বদের পক্ষে আছি। এ লক্ষ্যেই তারা ইমাম হুসাইনের স্মরণকে জাগরুক রাখে।

গ) আল্লাহর ওলীদের জন্য   ন্দন জায়েয হওয়ার সপক্ষে দলিল :

১। ক্রন্দনের সপক্ষে দলিল : হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে আমরা দেখি দ্বীনের ধারক- বাহকগণ আল্লাহর ওলীদের শোকে ক্রন্দন করেছেন। এখানে এরূপ কিছু নমুনা আমরা তুলে ধরছি।

ক) তাবারী নিজ সূত্রে হযরত আলী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ‘যখন কাবিল স্বীয় ভ্রাতা হাবিলকে হত্যা করে তখন হযরত আদম (আ.) তার শোকে ক্রন্দন করেছেন।’[৩৩৮]

খতাবারী বর্ণনা করেছেন (, ‘হযরত ইয়াকুব হতে হযরত ইউসুফের বিচ্ছিন্ন থাকার সময়কাল ছিল চল্লিশ বছর। এই চল্লিশ বছর হযরত ইয়াকুব হযরত ইউসুফের বিচ্ছেদে ক্রন্দন করেছেন।’[৩৩৯]

গ) ইবনে মাসউদ বলেছেন, ‘আমরা রাসূলকে হামজা (রা.)- এর শাহাদাতের দিনের ন্যায় ক্রন্দন করতে কখনোই দেখি নি।’[৩৪০]

৪) ইবনে আবি শাইবা স্বীয় সূত্রে ইবনে মাসউদ হতে বর্ণনা করেছেন, ‘একদিন আমরা রাসূলের নিকট বসেছিলাম। হঠাৎ বনী হাশিমের একদল নারী- পুরুষ সেখানে আসল। মহানবী তাদেরকে দেখা মাত্রই কাঁদতে শুরু করলেন এবং তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! কেন আপনার চেহারায় বিষন্নতা লক্ষ্য করছি?

তিনি বললেন : আমরা এমন এক বংশ যাদের আখেরাতকে আল্লাহ দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। বেশি দূরে নয়, আমার আহলে বাইতের উপর বিপদাপদ ও নির্বাসনের দুর্যোগ নেমে আসবে।’[৩৪১]

৫। বুখারী নিজ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ‘যখন হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব, যাইদ ইবনে হারেসা এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ রাসূলের নিকট পৌঁছল তখন তিনি ক্রন্দন করেছিলেন।’[৩৪২]

৬। ইবনে আসির বর্ণনা করেছেন, ‘হযরত জাফর (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের শাহাদাতের খবর শোনার পর রাসূল (সা.) জাফরের গৃহে গেলেন ও তাঁর সন্তানদের নিজের কাছে ডাকলেন। তাদের কোলে নিয়ে মুখে চুমু খেলেন ও ক্রন্দন করলেন। জাফরের স্ত্রী আসমা তাঁকে বললেন : হে নবী! আমার পিতা- মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। কেন আপনি ক্রন্দন করছেন? আপনার নিকট জাফরের কোন খবর এসেছে কি? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, সে আজ শহীদ হয়েছে।’ আসমা বলেন, ‘আমি গৃহের ভেতরে প্রবেশ করে মহিলাদের সাথে নিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলাম।

তখন হযরত ফাতিমা (আ.) সেখানে আসলেন ও ‘হে চাচা’ বলে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূল (সা.) তখন বললেন, ‘ক্রন্দনকারীদের উচিত জাফরের মতো ব্যক্তির জন্যই ক্রন্দন করা।’[৩৪৩]

(৭) মুসলিম নিজ সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা হতে বর্ণনা করেছেন, ‘মহানবী (সা.) একদিন তাঁর মাতার কবর জিয়ারতে গেলেন এবং এতটা কাঁদলেন যে, তাঁর পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও কাঁদতে শুরু করলেন।’[৩৪৪]

৮) হাকিম নিশাবুরী নিজ সূত্রে হযরত আয়েশা হতে বর্ণন করেছেন, ‘মহানবী (সা.) উসমান ইবনে মাজউনের মৃত্যুর পর তাঁকে চুম্বন করেন ও ক্রন্দন করেন।[৩৪৫]

৯) ইবনে মাজা আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণনা করেছেন, ‘মহানবী (সা.) তাঁর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর পর আদেশ দেন তাকে না দেখার পূর্বে যেন কাফনে আবৃত করা না হয়। অতঃপর ইবরাহীমের মৃতদেহের নিকট এসে পুত্রের উপর উপুড় হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন।’[৩৪৬]

১০) ইবনে আব্বাস মালিকী ইমাম সাদিক (আ.) হতে বর্ণনা করেন, ‘হযরত ফাতিমা যাহরার ইন্তেকালের পর হযরত আলী (আ.) প্রতিদিন তাঁর কবর জিয়ারতে যেতেন। একদিন জিয়ারতে গিয়ে কবরের উপর আপতিত হয়ে এ কবিতাটি পাঠ করেন, [৩৪৭]

مالی مررت علی القبور مسلّما

یا قبر الحبیب فلم یرد جوابی

یا قبر ما لک لا تجیب منادیا

أمللت بعدی خلّة الاحباب

১১) ইবনে কুতাইবা বর্ণনা করেছেন, সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (আ.) আদীকে প্রশ্ন করেন : ‘আম্মার কি নিহত হয়েছেন? ’তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ!’তখন আমীরুল মুমিনীন কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন : ‘আল্লাহ তাঁকে রহম করুন।’[৩৪৮]

১২) সিবতে ইবনে জাওযী বর্ণনা করেছেন, ‘যখন মুহাম্মদ ইবনে আবি বাকরের শাহাদাতের খবর হযরত আলীর নিকট পৌছল তখন তিনি দুঃখ প্রকাশ করে ক্রন্দন করলেন এবং তাঁর হত্যাকারীর উপর লানত (অভিসম্পাত) বর্ষণ করলেন।’[৩৪৯]

১৩) ইয়াকুবী বর্ণনা করেছেন, ‘হযরত খাদিজা (আ.)- এর ইন্তেকালের পর হযরত ফাতিমা (আ.) রাসূলের নিকট এসে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে লাগলেন, ‘আমার মাতা কোথায়? আমার মাতা কোথায়?’[৩৫০]

১৪) ইবনে আবিল হাদীদ বর্ণনা করেছেন, ‘যে রাতে হযরত আলী (আ.) শহীদ হন পরের দিন ভোরে ইমাম হাসান (আ.) কুফার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণার পর হযরত আলীর পরিচয় দিতে গিয়ে শোকে কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। ফলে শ্রোতারাও হযরত আলীর শোকে কাঁদতে শুরু করলেন।’[৩৫১]

১৫) কা যী হানাফী হযরত আব্বাস ইবনে আলী (আ.)- এর শাহাদাতের বর্ণনায় বলেন, ‘এক ব্যক্তি লৌহনির্মিত বল্লম দিয়ে তাঁর পবিত্র মস্তকে আঘাত হানলে তা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং তিনি ঘোড়া হতে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং চিৎকার করে বলেন, ‘হে ভ্রাতা! হে আবা আবদিল্লাহ্! হে হুসাইন! আপনার উপর আমার সালাম।’ ইমাম হুসাইন দ্রুত তাঁর নিকট পৌঁছলেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে লাগলেন : হে আমার ভ্রাতা, আব্বাস! আমার দেহের অংশ।’ তাঁর নিকট দণ্ডায়মান শত্রুদের সরিয়ে দিয়ে তাঁর দেহকে মাটি থেকে উঠিয়ে নিয়ে তাঁর তাঁবুর ভিতর রাখলেন। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, ‘আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।’[৩৫২]

১৬) তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, ‘হুর ইবনে ইয়াযীদ রিয়াহির শাহাদাতের পর উমর ইবনে সাদের সৈন্যরা তাঁর দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ইমাম হুসাইনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে। ইমাম হুসাইন তাঁর মাথাটি কোলে নিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং তাঁর মুখের উপর থেকে রক্তগুলো পরিষ্কার করতে লাগলেন। অতঃপর তাঁর মস্তকের উদ্দেশে বললেন, ‘তোমার মাতা তোমার নাম ভুল রাখেন নি। তুমি হুর অর্থাৎ স্বাধীন। পৃথিবীতেও তুমি স্বাধীন ছিলে, আখেরাতেও স্বাধীন ও সৌভাগ্যবান হলে।’[৩৫৩]

১৭) ইবনে আসাকির তাঁর সূত্রে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম সাজ্জাদ (আ.)- কে প্রশ্ন করা হলো : কেন আপনি ইমাম হুসাইনের জন্য এত অধিক কান্নাকাটি করেন? তিনি জবাবে বললেন : 'আমাকে এজন্য সমালোচনা করো না। কারণ ইয়াকুব (আ.) তাঁর এক সন্তান নিখোঁজ হওয়াতে এতটা ক্রন্দন করেন যে, তাঁর চোখ সাদা হয়ে যায়। অথচ তিনি জানতেন তাঁর সন্তান জীবিত আছেন। আর আমি আমার চোখের সামনে আমার পরিবারের চৌদ্দজন সদস্যকে জবেহ করে হত্যা করতে দেখেছি। তোমরা কি চাও এই চরম দুঃখ- কষ্টের বিষয়টি আমার মন থেকে মুছে ফেলতে?'[৩৫৪]

১৮) সিবতে ইবনে জাওযী বলেছেন, 'ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের পর ইবনে আব্বাস (রা.) এতটা ক্রন্দন করতেন যে, তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'[৩৫৫]

১৯) ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেছেন, যায়েদ ইবনে আরকাম ইবনে যিয়াদের উদ্দেশে বলেন, 'তুমি তোমার লাঠিটি হুসাইনের দাঁত থেকে সরাও। আল্লাহর শপথ আমি অসংখ্যবার লক্ষ্য করেছি আল্লাহর রাসূল (সা.) ঐ ঠোঁট দু'টিতে চুম্বন করেছেন।' এই বলে তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন।[৩৫৬]

২০) ইবনে হাজার হাইসামী বর্ণনা করেছেন, 'উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রা.) ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের খবর শুনে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন : তারা এমন জঘন্য কাজ করেছে? হুসাইনকে হত্যা করার কারণে আল্লাহ তাদের কবরকে অগ্নিতে পূর্ণ করুন। অতঃপর এতটা ক্রন্দন করলেন যে, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।'[৩৫৭]

ঘ) **আল্লাহর ওলীদের জন্য শোকানুষ্ঠান পালনের বৈধতার বর্ণনা ও হাদীসভিত্তিক দলিল** :

হাদীস গ্রন্থসমূহ এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের জীবন চরিত অধ্যয়ন করলে আমরা দেখি ঐ মহান ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য শোক পালনের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন ও এরূপ অনুষ্ঠান পালন করতেন।

হাকিম নিশাবুরী সহীহ সূত্রে উম্মুল ফাজল হতে বর্ণনা করেছেন, 'একদিন রাসূল (সা.)- এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! গতরাত্রে আমি একটি দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

রাসূল বললেন : কি স্বপ্ন?

আমি বললাম : দুঃস্বপ্ন।

রাসূল বললেন : তা বল।

আমি বললাম : 'হে রাসূলাল্লাহ্! স্বপ্নে দেখলাম আপনার দেহের একটি টুকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার কোলে এসে পড়েছে।'

নবী (সা.) বললেন : তুমি ভালো স্বপ্ন দেখেছ। আল্লাহ চাইলে আমার কন্যা ফাতিমা এক পুত্রসন্তান জন্মদান করবে, যে তোমার কাছে প্রতিপালিত হবে।'

উম্মুল ফাজল বলেন : ফাতিমা (আ.) হুসাইন নামের এক পুত্রসন্তান জন্মদান করলে সে আমার কোলে প্রতিপালিত হয় যেমনটি রাসূল (সা.) বলেছিলেন। হুসাইন (আ.) জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে রাসূলের কোলে দিলে লক্ষ্য করলাম তিনি শিশুটিকে কোলে নিয়ে ক্রন্দন করছেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। কেন আপনি ক্রন্দন করছেন? রাসূল বললেন : 'জীবরাঈল (আ.) আমার কাছে এসে খবর দিলেন যে, আমার উম্মত অতি নিকটেই তাকে হত্যা করবে।'

আমি বললাম : এই শিশুকে?

তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, অতঃপর তাঁর শাহাদাতের ভূমি হতে এক টুকরা মাটি আমার হাতে দিলেন।'[৩৫৮]

হাফেজ তাবরানী সহীহ সূত্রে শাইবান হতে বর্ণনা করেছেন, 'আমি হযরত আলীর সাথে কারবালায় প্রবেশ করলাম। তখন তিনি বললেন : এখানে এমন একদল লোক শহীদ হবে যাদের সঙ্গে বদরের শহীদগণ ব্যতীত কেউই তুলনীয় নয়।'[৩৫৯]

তিরমিযী সহীহ সূত্রে হযরত সালমা হতে বর্ণনা করেছেন, 'একদিন উম্মে সালমার নিকট গেলে তাঁকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখলাম। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'স্বপ্নে

আল্লাহর রাসূলকে অত্যন্ত শোকাহত অবস্থায় দেখলাম। তাঁর পবিত্র মস্তক ও মুখমণ্ডল ধুলায় আবৃত ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি হয়েছে?

তিনি বললেন : এখনই হুসাইনকে শহীদ করা হয়েছে।’[৩৬০]

আল্লাহর ওলীদের শোকানুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া

আল্লাহর ওলীদের, বিশেষত ইমাম হুসাইনের শোকে শোক পালন শুধু জায়েযই নয়, পছন্দনীয়ও বটে, যেমনটি দ্বীনের মহান ব্যক্তিত্বরা করতেন।

বুখারী স্বীয় সূত্রে হযরত আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন, ‘যখন হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবি তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ রাসূলের নিকট পৌঁছল তখন তিনি শোকাচ্ছন্ন হয়ে মসজিদে গিয়ে বসলেন।’[৩৬১]

ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূল (সা.) ওহুদের যুদ্ধ হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে শহীদদের গৃহসমূহে ক্রন্দনের রোল শুনলেন তখন মহানবীর চোখ অশ্রুসিক্ত হলো এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, ‘আফসোস হামজার জন্য কোন ক্রন্দনকারী নেই। এ কথা শুনে বনী আশহালের নারীরা হযরত হামজার গৃহে এসে ক্রন্দন করতে লাগলেন।’[৩৬২]

তথ্যসূত্র

১। সূরা ফা হ : ২৩।

২। সূরা আনফাল : ৩৮।

৩। সূরা কাহফ : ৫৫।

৪। উসুলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬, কিতবু ফাজলুল ইলম, বাবুর রাদ ইলাল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, হাদীস নং ৪।

*যেসব রেওয়ায়েতে সুন্নাত ও বিদআত শব্দ পাশাপাশি এসেছে তাতেও সুন্নাত এ প্রথম অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। ওয়াসায়িলুশ শিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭।

৬। ওয়াসায়িলুশ শিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭।

৭। অভিধান গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য। আল আইন, মুফরাদাত লি রাগিব ইসফাহানী, লিসানুল আরাব প্রভৃতি, ‘بدع’ ধাতু।

৮ । নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১৭৬।

৯। প্রাগুক্ত, খুতবা নং ১৬১।

১০। প্রাগুক্ত, খুতবা নং ১৪৫।

১১। জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃ. ১৬০।

১২। ফাতহুল বারী, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৯।

১৩। রিসালাতু শারিফ আল মুরতাজা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪।

১৪। বিহারুল আনওয়ার, ৭৪তম খণ্ড, পৃ. ২০২।

১৫ । সূরা তাওবা : ৩১।

১৬। উসূলে কাফী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল ঈমান ওয়াল কুফর, শিরক অধ্যায়; তাফসীরে তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০।

১৭। সূরা হাদীদ : ২৭।

১৮। উসূলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪, কিতাবুল ফাজলিল ইলম, বিদআত অধ্যায়, হাদীস নং- ৮।

১৯। সূরা ইউনুস : ৫৯।

২০। সূরা বাকারা : ৭৯।

২১। সহীহ মুসলিম, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬২, কিতাবুল ইলম। সহীহ বুখারী, ৯ম খণ্ড, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ (কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের অপরিহার্যতা অধ্যায়)

২২। সূরা আনফাল : ৬০।

২৩। সূরা হাজ্জ্ব : ৩২।

২৪। ইবনে আসির, আন নেহায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯।

২৫। সূরা আনআম : ১৪৫।

২৬। আল হালাল ওয়াল হারাম, পৃ. ৩৩- ৩৫।

২৭। সূরা আহযাব : ৩৩।

২৮। সহীহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩০।

২৯। তাফসীরে আল মিযান, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৩১২।

৩০। সহীহ তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬২১।

৩১। বিন বায, ফতোয়াসমগ্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৮।

৩২। বিন বায, ফতোয়াসমগ্র, পৃ. ৪১৭।

৩৩। মাফাতিহুল গাইব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৯।

৩৪। সূরা ফাজর : ২৭

৩৫। সূরা যুমার : ৪২।

৩৬। সূরা আলে ইমরান : ১৬৯।

৩৭। সূরা নিসা : ৬৯।

৩৮। সূরা হাদীদ : ৪।

৩৯। সূরা বাকারা : ১১৫।

৪০। সূরা কাফ : ১৬।

৪১। সূরা মুমিন : ১৬। অন্যত্র সূরা তওবার ১০৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তোমরা তোমাদের কর্ম কর। অতঃপর আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ তোমাদের কর্মকে দেখবেন।’ এ আয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পাশাপাশি মুমিনদের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ তাঁরাও মুনাফিক

ও কাফেরদের কর্ম দেখেন। নিঃসন্দেহে এ আয়াত শুধু কিয়ামত দিবস সংশ্লিষ্ট নয়, কারণ সেদিন সকল মানুষই, এমনকি মন্দ ব্যক্তিরাও মুনাফিক ও কাফেরদের আমলনামা দেখবে।

৪২। সূরা জ্বীন : ২৬- ২৭।

৪৩। সহীহ বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৬- ৭৭, 'আবু জাহলের হত্যা' অধ্যায় ।

৪৪। সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩, 'মৃত ব্যক্তি জিয়ারতকারীর জুতার শব্দ শুনতে পায়' অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

৪৫। কানজুল উম্মাল, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৬১৯- ৬২০, হাদীস নং ৪৬০৮০।

৪৬। সূরা আরাফ : ৭৮- ৭৯।

৪৭। সূরা যুখরুফ : ৪৫।

৪৮। সূরা সাফফাত : ৭৯।

৪৯। সূরা সাফফাত : ১০৯।

৫০। সূরা সাফফাত : ১২০।

৫১। সূরা সাফফাত : ১৩০।

৫২। সূরা সাফফাত : ১৮১।

৫৩। শালাতুত, আল ফাতাওয়া, পৃ. ১৯।

৫৪। শাইখুল ইসলাম ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস সালামের ফতোয়া সমগ্র, পৃ. ৩১

৫৫। ইবনে কাইয়্যেম জাওযীয়া, আররুহ, পৃ. ৯।

৫৬। ইবনে কাইয়্যেম জাওযীয়া, আররুহ, পৃ. ৯।

৫৭। আররুহ, পৃ. ৯।

৫৮। প্রাগুক্ত।

৫৯। ফাইজুল ক্বাদীর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৭।

৬০। মূসা মুহাম্মদ আলী, হাকীকাতু তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসিলাহ, পৃ. ২৪২

৬১। আররুহ, পৃ. ৮।

৬২। ফাতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫।

৬৩। তালখিসুল হাবির, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭।

৬৪। সহীহ তিরমিযী, ‘কিতাবে ফাজায়িলুল কুরআন।

৬৫। মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১১।

৬৬। ফাইজুল ক্বাদীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪।

৬৭। সিলসিলাতুল আহাদীসুস সাহীহাহ, হাদীস নং ৬২১।

৬৮। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৭, হাদীস নং ২২৪২।

৬৯। প্রাগুক্ত।

৭০। সুনানে দারেমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬- ৫৭, হাদীস নং ৯৩।

৭১। মুসা, মুহাম্মাদ আলী, হাকীকাতুত তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসিলাহ, পৃ. ২৭১।

৭২। মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১১।

৭৩। প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৪; সুয়ূতী, আল খাসাইসুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮১।

৭৪। সুয়ূতী, আলহাভী লিল ফাতওয়া।

৭৫। হাকিকাতুত তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসিলাহ্, পৃ. ২৬৫। (হাকিম নিশাবুরী হতে বর্ণিত)

৭৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

৭৭। আর রুহ, পৃ: ১৬- ১৮।

৭৮। প্রাগুক্ত।

৭৯। প্রাগুক্ত।

৮০। প্রাগুক্ত।

৮১। প্রাগুক্ত।

৮২। প্রাগুক্ত।

৮৩। প্রাগুক্ত।

৮৪। আর রুহ, পৃ. ১৮- ১৯।

৮৫। প্রাগুক্ত।

৮৬। প্রাগুক্ত।

৮৭। সূরা নাজম : ৩৯।

৮৮। সুরা তুর, ২১।

৮৯। শিফাউস সুদুর বিশারহি হালিল মাওতা ওয়াল কুবুর।

৯০। সূরা মুমিন : ৭।

৯১। সূরা শুরা : ৫।

৯২। সূরা হাশর : ১০।

৯৩। সহীহ মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫- ১৫৬, মৃতের পক্ষে রোজার কাযা আদায় অধ্যায়।

৯৪। প্রাগুক্ত।

৯৫। প্রাগুক্ত।

৯৬। সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৩- ৭৮; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৮- ৬০২, হাদীস নং ১৭০৫০- ১৭০৭১; আররুহ, পৃ. ১১৮- ১২১।

৯৭। শেখ আবদুল্লাহ্ হাবাশী, সারিহুল বায়ান, পৃ. ১৭৬।

৯৮। সূরা রুম : ৫২।

৯৯। সূরা ফাতির : ২২।

১০০। আর রুহ, পৃ. ৪৫- ৪৬।

১০১। মুখতাছারু তাফসীরে ইবনে কাছির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

১০২। আল ইস্তিগাসা।

১০৩। মিনহাজুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১।

১০৪। ইরশাদুস সারি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৯।

১০৫। আত তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসিলাহ, পৃ. ৭২।

১০৬। আত তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসিলাহ, পৃ. ১৫৬।

১০৭। মাজমুয়াতু ফাতওয়া লি বিন বায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৪- ৭৫৫।

১০৮। আল লাজনাতুদ দায়িমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়া ওয়াল ইফতাহ, ফতোয়া নং ৪২৩।

১০৯। আনওয়ারুত তানযীল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৬।

১১০। রুহুল মায়ানী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

১১১। আল মোজামুল কাবির, তাবরানী, ১১তম খণ্ড, পৃ. ২০২, হাদীস নং ১১৬৫৩।

১১২। সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬, হাদীস নং ১০৭, কিতাবুল জানায়িয।

১১৩। মুসতাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩১, হাদীস নং ১৩৮৯।

১১৪। প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৩৯০।

১১৫। সুনানে ইবনে দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ.. ২১৮, হাদীস নং ৩৫৭, কিতাবুল মানাসিক, জিয়ারতে কবর অধ্যায়।

১১৬। সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩, হাদীস নং ১০২, কিতাবুল জানায়িয।

১১৭। মুসতাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৩, হাদীস নং ১৩৯৬।

১১৮। মুসতাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৩, হাদীস নং ১৩৯৬।

১১৯। আর রিয়াদুন নাদ্বরাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০।

১২০। মুসতাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩২, হাদীস নং ১৩৯২।

১২১। উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩।

১২২। আকদুল ফারিদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩।

১২৩। তারিখুল বাগদাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

১২৪। তাহজীবুত তাহজীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯।

১২৫। মারেফাতুস সুনান ওয়াল আসার, শাফেয়ী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৩, কবর জিয়ারত অধ্যায়।

১২৬। মুসতাদরাকে হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭।

১২৭। মুসতাদরাকে হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭।

১২৮। আল মুহাল্লা, ৫ম খণ্ড, পৃ১৬০ ., মাসআলা ৬০০; ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ . ৫২১; আল ফিকহ আলা মাযাহিবিল আরবায়া, ১ম খণ্ড, পৃ ।৫৪০ .

১২৯। সূরা নিসা : ৬৪।

১৩০। শিফাউস সিকাম, পৃ. ৮১- ৮২।

১৩১। ওয়াফা উল ওয়াফা, সামহুদী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৬১।

১৩২ । প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১২।

১৩৩। প্রাগুক্ত।

১৩৪। সুনানে দারে কুতনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮; সুনানুল কুবরা, বায়হাকী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫।

১৩৫। সুনানে দারে কুতনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮, হাদীস নং ১৯২।

১৩৬। আত তাজুল জামে লিল উছুল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০।

১৩৭। ওয়াফা উল ওয়াফা , ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৪২।

১৩৮। শিফাউস সিকাম, পৃ. ৩৭।

১৩৯। সীরাতে জাইনী দাহলান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১০। ইরশাদুস সারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫২।

১৪০। উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯; মুখতাছারু তারিখে দামেস্ক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৮।

১৪১।ওয়াফাউল ওয়াফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৪০।

১৪২। মুস্তাদরাকে হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৬০, হাদীস নং ৮৫৭১।

১৪৩। তাহজীবুল আহকাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮- ৭৯, হাদীস নং ৩।

১৪৪। বিহারুল আনওয়ার, ৯৮তম খণ্ড, পৃ. ৩; আমালী, শেখ সাদুক, পৃ. ১১৬।

১৪৫। বিহারুল আনওয়ার, ৯৮তম খণ্ড, পৃ. ৫।

১৪৬। সূরা নিসা : ৬৪।

১৪৭। সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ৩৬৬ ., হাদীস নং ১০৭, কিতাবুল জানাইজ; সহীহ তীরমিজী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭০।

১৪৮। ওয়াফা উল ওয়াফা, সামহুদী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১২।

১৪৯। উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ৩০৮ -৩০৭ .; মুখতাছারে তারিখে দামেস্ক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ . ১১৮, তাহজীবুল কামাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ।২৮৯ .

১৫০। শিফাউস সিকাম, পৃ. ৫৫।

১৫১। তারিখে বাগদাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

১৫২। তাহজীবুত তাহজীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯।

১৫৩। সুনানে আবি দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮, হাদীস নং ৩৫৭।

১৫৪। মুসতাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৩।

১৫৫। সহীহ মুসলিম।

১৫৬। সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ১৩৬ ., কিতাবুস সালাত; সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ . ১২৬, কিতাবুল হজ্জ্ব।

১৫৭। ইহইয়াউল উলুম, গাজ্জালী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭, সফরের আদব অধ্যায়।

১৫৮ আল বিদআহ, ডক্টর আবদুল মালিক সাদী, পৃ. ৬০।

১৫৯। আল লাজনাতুদ দায়িমাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮।

১৬০। মাজমুয়াতু ফাতাওয়া, বিন বায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৭।

১৬১। প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৩, ৭৫৪।

১৬২। আল মুসান্নাফ, আব্দুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭২; আস সুনান আল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩১।

১৬৩। সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৫, হাদীস নং ১০৬; মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং ৯৩৯৫; সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০১, হাদীস নং ১৫৭২।

১৬৪। আল মোজামুল কাবির, তাবরানী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪, হাদীস নং ১৪১৯।

১৬৫। তাহজীবুল আহকাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮- ৭৯, হাদীস নং ৩।

১৬৬। আবুশ শুহাদা, আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ, পৃ. ১২৯।

১৬৭। মুসতাদরাকে হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯।

১৬৮। সূরা শুরা : ২৩।

১৬৯। তাহজীবুল আহকাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮- ৭৯।

১৭০। কামিলুজ জিয়ারাত, পৃ: ১৩১।

১৭১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

১৭২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

১৭৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

১৭৪। কামিলুজ জিয়ারাত, পৃ. ১৫১।

১৭৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

১৭৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

১৭৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

১৭৮। মিনহাজুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৭, ৪৩৫।

১৭৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪- ৪৭৯।

১৮০। কাশফুল ইরতিয়াব, পৃ. ২৮৬, তাহরীরুল ইতিকাদে সানআনির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত।

১৮১। আল লাজনাতুদ দায়িমাহ লিল বুহসেল ইলমিয়া ওয়াল ইফতা, ফতওয়া নং ৭২১০।

১৮২। তাহযীরুল মাসাজিদি মিন ইত্তিখাযিল কুবুর মাসাজিদা, আলবানী, পৃ. ৬৮- ৬৯

১৮৩। সূরা হাজ্জ্ব : ৩২।

১৮৪। সূরা বাকারা : ১৫৮।

১৮৫। সূরা হাজ্জ্ব : ৩৬।

১৮৬। তাফসীরে কুরতুবী, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৫৬।

১৮৭। সূরা শুরা : ২৩।

১৮৮। সূরা যুখরুফ : ৩৩।

১৮৯। তাফসীরে আল বুরহান, বাহরানী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭।

১৯০। সূরা মারইয়াম : ৫৭।

১৯১। আল কাশশাফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯০।

১৯২। রুহুল বায়ান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

১৯৩। দুররূল মানসূর, ৫ খণ্ড, পৃ. ৫০।

১৯৪। ওয়াফিয়াতুল আইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ১৭০ .; আল মুনতাজাম, ৭ম খণ্ড, পৃ . ২১৬, রওজাতুল জান্নাত, ৩য় খণ্ড, পৃ ।১৪৮ .

১৯৫। সহীহ বুখারী, কিতাবুল জানাযিয়া, হাদীস নং ৬২।

১৯৬। ইয়ানাতুত তালেবীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০।

১৯৭। তারিখুল মাদিনাতুল মুনাওয়ারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

১৯৮। ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৯৯। তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯১।

২০০। তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৯।

২০১। সুনানে আবি দাউদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১১; আস সিরাতুল হালাবীয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫।

২০২। তাবাকাতে ইবনে সাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৯।

২০৩। সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৯।

২০৪। তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮০।

২০৫। মিনহাজুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪।

২০৬। আবি মালিকী, মাকালাতুল কাউসারী, পৃ. ১৪৬, শারহে সহীহ মুসলিম সূত্রে বর্ণিত ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

২০৭। জারীদাতু উম্মুল কোরা, তারিখ ১৭ই শাওয়াল, ১৩৪৪ হিজরী। (উম্মুল কোরা পত্রিকা)

২০৮। আলফিকহ আলা মাজাহিবিল আরবায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২১।

২০৯। নাভাভী, শারহে সহীহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭, কিতাবুল জানায়িয।

২১০। মাকালাতুল কাউসারী, পৃ. ২৪৭; (আল মুদাভভিনাতুল কুবরা, ১ ম খণ্ড, পৃ. ৯০ উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত)

২১১। আল মুহাল্লা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩।

২১২। আল মাজমু, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮।

২১৩। আল হাকিকাতুন নাদীয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩০।

২১৪। সহীহ মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১, কিতাবুল জানায়িয।

২১৫। তাহজীবুত তাহজীব, ১১তম খণ্ড, পৃ. ১২৩।

২১৬। তাহজীবুত তাহজীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৫।

২১৭। প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯।

২১৮। প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬২।

২১৯। আল্লামা বাছরুদ্দীন হাওসী রচিত জিয়ারাতুর কুবুর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২২০। কানজুল উম্মাল, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৭৩৬, হাদীস নং ৪২৯৩২।

২২১। সহীহ মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২।

২২২। তাহজীবুত তাহজীব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪০৬।

২২৩। মশহুর (প্রসিদ্ধ) হাদীসের বিপরীতে অবিশ্বস্ত রাবীদের হতে বর্ণিত বিরল হাদীস।

২২৪। তাহজীবুত তাহজীব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৬।

২২৫। প্রাগুক্ত।

২২৬। তাহজীবুত তাহজীব, আবুজ জুবাইর অনূদিত।

২২৭। সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪।

২২৮। ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬।

২২৯। আল কায়েদাতুল জালিলাহ, পৃ. ২২।

২৩০। জিয়ারাতুল কুবুর, পৃ. ১০৬।

২৩১। সূরা কাহফ : ২১।

২৩২। মাফাতিহুল গাইব, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১০৫।

২৩৩। আল বাহরুল মুহিত, উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীরে।

২৩৪। তাফসীরে আবিস সাউদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৫।

২৩৫। তারিখে ইবনে আসাকির, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪; আল ইসতিয়াব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১- ২৩।

২৩৬। সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮।

২৩৭। মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬।

২৩৮। সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. কিতাবুল মাসজিদ।

২৩৯। সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ১১১ ., কিতাবুল জানায়িয; সুনানে নাসায়ী, ২য় খণ্ড, পৃ . ৮৭১, কিতাবুল জানায়িয।

২৪০। সুনানে নাসায়ী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১।

২৪১। সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১১।

২৪২। আল মাকালাতুস সুন্নীয়া, পৃ. ৪২৭।

২৪৩। আল হাদীকাতুস সানিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩১।

২৪৪। জিয়ারাতুল কুবুর, পৃ. ২৮।

২৪৫। ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

২৪৬। কোন বিষয়ের পারিপার্শ্বিক ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোকে ছাড় দিয়ে তা হতে সার্বিক ও সর্বজনীন বিধি হস্তগত করা। যেমন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে যদি বিশেষ কোন ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে বলা হয়, যেহেতু সেই ব্যক্তি ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ তাকে বলা হয় তুমি এ বিষয়ে না জানলে অমুককে জিজ্ঞেস কর। এ বাক্য হতে বিশেষ দিকগুলো বাদ দিয়ে আমরা সার্বিকভাবে বলতে পারি যে, কোন বিষয়ে যে কেউ কিছু না জানলে ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

২৪৭। তাহজীরুল মাসাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবুরী মাসাজিদা, আলবানী, পৃ. ৪৩- ৪৪।

২৪৮। শারহে জামুয়ুস সাগীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮।

২৪৯। শারহে সুনানে নাসায়ী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৫।

২৫০। আত তাজুল জামে লিল উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮১।

২৫১। তারিখে বাগদাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

২৫২। আল মুনতাজাম, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৮৩।

২৫৩। ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১০।

২৫৪। আল জামে আস সাহীহ, ৩য় খণ্ড, ৬২তম অধ্যায়, পৃ. ৩৭২।

২৫৫। মাতেরিদী মতবাদে বিশ্বাসী যা আশআরী ও মুতাজিলা মতবাদের মধ্যপন্থি একটি মতবাদ।

২৫৬। তাভিলাতু আহলিস সুন্নাহ, পৃ. ১৪৮।

২৫৭। আত তাওয়াররুফ লি মাজাহাবি আলহিত তাসাউফ, পৃ. ৫৪- ৫৫।

২৫৮। আওয়াইলুল মাকালাত, পৃ. ১৫।

২৫৯। আততিবইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৩- ২১৪।

২৬০। আল আকায়েদুন নাসাফীয়া, পৃ. ১৪৮।

২৬১। প্রাগুক্ত।

২৬২। নাভাভী, শারহে সহীহ মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫।

২৬৩। আনওয়ারুত তানযীল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২।

২৬৪। রওজাতুল ওয়ায়েযীন, পৃ. ৪০৬।

২৬৫। মাজমাতুর রাসাইল আল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩।

২৬৬। সূরা বনি ইসরাঈল : ৭৯।

২৬৭। আল ইয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭০।

২৬৮। বিহারুল আনওয়ার, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৯।

২৮৯। আল হাদীয়াতুস সানীয়াহ, পৃ. ৪২।

২৭০। সূরা বাকারা : ৪৭- ৪৮।

২৭১। সূরা আল মুদাসসির : ৪৬- ৪৮।

২৭২। সূরা ইউনুস : ১৮।

২৭৩। সূরা যুমার : ৪৪।

২৭৪। সূরা ইউনুস : ৩।

২৭৫। সূরা সাবা : ২৩।

২৭৬। সূরা কাহফ : ৮৮।

২৭৭। সূরা বাকারা : ৬৪।

২৭৮। সূরা নাহল : ৬১।

২৭৯। সূরা ফাতির : ৪৫।

২৮০। সূরা মুমিন : ৭।

২৮১। সূরা আনআম : ১৪৭।

২৮২। সূরা বাকারা : ২৫৫।

২৮৩। সুনানে ইবনে মাজা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪১।

২৮৪। সূরা শুরা : ২৫।

২৮৫। সূরা বাকারা : ২৫৫।

২৮৬। সূরা ইউনুস : ১৮।

২৮৭। সূরা ইউনুস : ১৮।

২৮৮। সূরা আম্বিয়া : ২৬- ২৮।

২৮৯। জিয়ারাতুল কুবুর, পৃ. ১৫৬।

২৯০। আল হাদিয়াতুস সানিয়া, পৃ. ৪২।

২৯১। সহীহ তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২, ‘পুল সিরাত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে’ অধ্যায়।

২৯২। সূরা ইউসুফ : ৯৭।

২৯৩। সূরা নিসা : ৬৪।

২৯৪। সূরা ইউনুস : ১৮।

২৯৫। সূরা ত্বাহা : ১০৯।

২৯৬। সূরা মুমিন : ১৮।

২৯৭। বিহারুল আনওয়ার, ৮২তম খণ্ড, পৃ. ২৩৫।

২৯৮। সুরা আম্বিয়া : ২৮।

২৯৯ । বিহারুল আনওয়ার, ১১তম খণ্ড, পৃ. ১০৫।

৩০০। সূরা সিজদা : ৭।

৩০১। মাজমুয়ে আসার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

৩০২। তাফসীরে আল মিনার, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৭।

৩০৩। রিসালাতু জিয়ারাতুল কুবুর, পৃ. ১৫৯।

৩০৪। মাজমুআতুর রাসায়েল ওয়াল মাসায়িল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০।

৩০৫। ইগাসাতুল লুহফান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪।

৩০৬। জিয়ারতুল কুবুর , পৃ. ১৫৯- ১৬০।

৩০৭। ফাতাওয়া নুরুন আলা দারবেন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০২।

৩০৮। সূরা আলে ইমরান : ৯৬।

৩০৯। সূরা আম্বিয়া : ৭১।

৩১০। সূরা নাযিয়াত : ১৬।

৩১১। ত্বাহা : ১২।

৩১২।সূরা আম্বিয়া : ৮১।

৩১৩। সূরা বনি ইসরাঈল : ১।

৩১৪। সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭, কিতাবুল মাগাযী।

৩১৫। সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯, কিতাবুস সালাত।

৩১৬। হালাবী, সীরাতুল হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬।

৩১৭। ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২।

৩১৮। ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫ ।

৩১৯। জামাখশারী, আল কাশশাফ, সূরা কাহফ : ২১।

৩২০। আল খাসায়িসুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

৩২১। আল মোজামুল কাবির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৪।

৩২২। সহীহ ইবনে হাব্বান।

৩২৩। ওয়াফাউল ওয়াফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৭৬।

৩২৪। আল মুদাভভেনাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯০।

৩২৫। আল হাদীকাতুন নাদিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩১।

৩২৬। শারহুশ শিফা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১৭।

৩২৭। প্রাগুক্ত।

৩২৮। আল মুজামুল কাবির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

৩২৯। আল ফিসাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৪।

৩৩০। হাকীকাতুত তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসিলা, পৃ. ১৪৫।

৩৩১। ফাতাওয়া নুরুন আলা দারব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০২।

৩৩২। ইবনে তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২- ৫৫।

৩৩৩। মুস্তাদরাকে হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

৩৩৪। সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে 'তীয়ার' ও 'রায়েহ' তেও তার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

৩৩৫। সূরা সাফফাত : ২৪।

৩৩৬। তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃ. ১০।

৩৩৭। তারিখে দামেস্ক, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১৪৩।

৩৩৮। সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩।

৩৩৯। তারিখে তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।

৩৪০। তারিখে তাবারী, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৩২।

৩৪১। আল মুসান্নিফ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৯৭।

৩৪২। সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০, সাহাবীদের ফজিলতের অধ্যায়।

৩৪৩। কামিল, ইবনে আসির, ২য় খণ্ড, পৃ ।৯০ .

৩৪৪। সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ ।৯০ .

৩৪৫। মুসতাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১।

৩৪৬। সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩, কিতাবুল জানায়িয।

৩৪৭। প্রাগুক্ত

৩৪৮। আল ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ।

৩৪৯। তাযকিরাতুল খাওয়াছ, পৃ. ১০৭।

৩৫০। তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫।

৩৫১। ইবনে আবিল হাদীদ, শারহে নাহজুল বালাগা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১১।

৩৫২। ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাহ, পৃ. ৪০৯।

৩৫৩। ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাহ, পৃ. ৪১৪।

৩৫৪। তারিখে দামেস্ক, ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.) জীবনী অধ্যায়, পৃ ৫৬।

৩৫৫। তাযকিরাতুল খাওয়াছ, পৃ. ১৫২।

৩৫৬। উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১।

৩৫৭। সাওয়ায়েকে মুহরিকা, পৃ. ১৯৬।

৩৫৮। মুস্তাদরাকে হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬; কানজুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৩।

৩৫৯। মাকতালে খাওয়ারেজমী, পৃ. ১৬২।

৩৬০। মুস্তাদরাক আল সাহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯।

৩৬১। ইরশাদুস সারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৩।

৩৬২। আস সীরাতুন নাবাভী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৫।

সূচীপত্র

সুন্নাত ও বিদআত. 5

বারজাখের জীবন 20

কবরে বা বারজাখে নবিগণের জীবন 30

কবর জিয়ারত 40

কবরের উপর সৌধ নির্মাণ 71

আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট মসজিদ নির্মাণ ও আলো জ্বালানো 91

শাফায়াত. 103

আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট নামাজ পড়া ও দোয়া করা 129

আল্লাহর ওলীদের জন্য শোক পালনের দর্শন 140

তথ্যসূত্র. 151